চতুর্থ অধ্যায়

সৃষ্টি-প্রকরণ

শ্লোক ১

সূত উবাচ

বৈয়াসকেরিতি বচস্তত্ত্বনিশ্চয়মাত্মনঃ।
উপধার্য মতিং কৃষ্ণে ঔত্তরেয়ঃ সতীং ব্যধাৎ ॥ ১ ॥

সূত উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **বৈয়াসকেঃ**—শুকদেব গোস্বামীর; **ইতি**—এইভাবে; **বচঃ**—বাণী; **তত্ত্বনিশ্চয়ম্**—সত্য নিরূপণকারী; **আত্মনঃ**—আত্মায়; **উপধার্য**—উপলব্ধি করে; **মতিম্**—মনের একাগ্রতা; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; **ঔত্তরেয়ঃ**—উত্তরার পুত্র; **সতীম্**—শুদ্ধ; **ব্যধাৎ**—প্রয়োগ করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেনঃ শুকদেব গোস্বামীর আত্মতত্ত্ব নির্ণায়ক বাণী শ্রবণ করে উত্তরানন্দন পরীক্ষিৎ নিষ্ঠা সহকারে তাঁর মনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণে একাগ্র করেছিলেন।

তাৎপর্য

সতীম্ শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তার অর্থ হচ্ছে 'বিদ্যমান' এবং 'শুদ্ধ'। এই দুটি অর্থই যথাযথভাবে পরীক্ষিৎ মহারাজের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। সমগ্র বৈদিক অধ্যবসায় মানুষের চেতনাকে পূর্ণরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের প্রতি আকৃষ্ট করায়, যা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) নির্দেশিত হয়েছে। সৌভাগ্যবশত মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর জীবনের শুরু থেকেই মাতৃজঠরে অবস্থানকালে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি যখন তাঁর মাতৃ গর্ভে ছিলেন তখন অশ্বত্থামা তাঁর প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র নামক আণবিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল। কিন্তু ভগবানের কৃপায় সেই আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বারা দগ্ধ হওয়ার হাত থেকে তিনি রক্ষা পান এবং তখন থেকেই তিনি নিরন্তর তাঁর মনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণে একাগ্র করেছিলেন, যার ফলে তিনি ভগবদ্ভক্তিতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্ঠাপরায়ণ হয়েছিলেন। অতএব স্বাভাবিকভাবে তিনি ছিলেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, এবং যখন তিনি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ থেকে জানতে পারেন যে তাঁর কর্তব্য হচ্ছে কেবল ভগবানেরই আরাধনা করা, তা সকামভাবেই হোক বা নিষ্কামভাবেই হোক,

তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক প্রীতি দৃঢ়তর হয়েছিল। সেই সমস্ত বিষয়ে আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি।

শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যথা ভক্তকুলে জন্মগ্রহণ এবং সদ্‌গুরুর কৃপাপ্রাপ্তি। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় পরীক্ষিৎ মহারাজ এই দুটি সৌভাগ্যই অর্জন করেছিলেন। তিনি পাণ্ডবদের মতো ভক্তদের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং পাণ্ডব বংশ রক্ষা করার জন্য এবং তাঁর প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করার জন্য ভগবান বিশেষভাবে পরীক্ষিৎ মহারাজকে রক্ষা করেছিলেন, যিনি পরবর্তীকালে ভগবানেরই ব্যবস্থাপনায় ব্রাহ্মণ বালক কর্তৃক অভিশপ্ত হন এবং শুকদেব গোস্বামীর মতো সদ্‌গুরুর সান্নিধ্য লাভ করেন। *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মঃ ১৯/১৫১)* বলা হয়েছে—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

এই তত্ত্বটি পরীক্ষিৎ মহারাজের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। ভক্তকুলে জন্মগ্রহণ করার ফলে তিনি স্বাভাবিকভাবে শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসেছিলেন, এবং এই যোগাযোগের ফলে তিনি নিরন্তর তাঁর কথা স্মরণ করেছিলেন, অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিমার্গে উন্নতিসাধনের জন্য রাজাকে আরেকটি সুযোগ প্রদান করেছিলেন। তাঁকে আত্মতত্ত্ব বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান সমন্বিত শ্রেষ্ঠ ভক্ত শুকদেব গোস্বামীর সান্নিধ্য প্রদান করার মাধ্যমে, এবং সদ্‌গুরুর উপদেশ শ্রবণ করার ফলে তিনি তাঁর বিশুদ্ধ মনকে স্বাভাবিকভাবে শ্রীকৃষ্ণে একাগ্র করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শ্লোক ২

আত্মজায়াসুতাগারপশুদ্রবিণবন্ধুষু।
রাজ্যে চাবিকলে নিত্যং বিরূঢ়াং মমতাং জহৌ ॥ ২ ॥

আত্ম—দেহ; **জায়া**—পত্নী; **সুত**—পুত্র; **আগার**—প্রাসাদ; **পশু**—হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি; **দ্রবিণ**—কোষাগার; **বন্ধুষু**—আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের; **রাজ্যে**—রাজ্যে; **চ**—ও; **অবিকলে**—বিচলিত না হয়ে; **নিত্যম্**—নিরন্তর; **বিরূঢ়াম্**—গভীর; **মমতাম্**—আসক্তি; **জহৌ**—ত্যাগ করেছিলেন।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সর্বান্তঃকরণে আকৃষ্ট হওয়ার ফলে মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর দেহ, জায়া, পুত্র, প্রাসাদ, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি পশু, রাজকোষ, বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি দৃঢ় আসক্তি চিরকালের জন্য ত্যাগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

মুক্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে *দেহাত্ম-বুদ্ধি* বা দেহরূপ আবরণ এবং দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত পত্নী, সন্তানাদি সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি। মানুষ দেহসুখের জন্য পত্নীর পাণিগ্রহণ করে এবং তার ফলে সন্তান-সন্ততি উৎপন্ন হয়। স্ত্রী-পুত্রদের জন্য বাসস্থানের প্রয়োজন হয়, এবং তার ফলে গৃহ নির্মাণের প্রয়োজন হয়। ঘোড়া, হাতি, গাভী, কুকুর ইত্যাদি গৃহপালিত পশু, গৃহস্থদের গৃহস্থালীর জন্য এ সমস্ত রাখতে হয়। আধুনিক সভ্যতায় হাতি, ঘোড়া ইত্যাদির স্থানে এসেছে পর্যাপ্ত অশ্বশক্তি সমন্বিত গাড়ি এবং অন্যান্য যানবাহন। গৃহস্থালীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মানুষকে তার ব্যাঙ্কের পুঁজি বাড়াতে হয় এবং কোষাগার সম্বন্ধে সচেতন হতে হয়। জাগতিক ধনসম্পদ উপস্থাপন করার জন্য মানুষকে আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়, এবং নিজের সামাজিক অবস্থা বজায় রাখতে হয়। একে বলা হয় জড় আসক্তি সমন্বিত জড় সভ্যতা। কৃষ্ণভক্তির অর্থ হচ্ছে পূর্বোল্লিখিত সমস্ত জড় আসক্তি বর্জন করা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় মহারাজ পরীক্ষিৎ সবরকম জড়জাগতিক সুবিধা এবং নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করেছিলেন রাজারূপে নির্বিঘ্নে তা ভোগ করার জন্য, কিন্তু ভগবানের কৃপায় তিনি সবরকম জড় আসক্তি ত্যাগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এইটিই শুদ্ধ ভক্তের প্রকৃতি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপে তাঁর প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণের বশে পরীক্ষিৎ মহারাজ সর্বদাই ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁর রাজকীয় কর্তব্য সম্পাদন করেছেন, এবং সারা পৃথিবীর একজন দায়িত্বশীল রাজারূপে তিনি সর্বদাই সতর্ক ছিলেন যাতে কলির প্রভাব তাঁর রাজ্যে প্রবেশ করতে না পারে। ভগবানের ভক্ত কখনোই তাঁর গৃহস্থালীকে তাঁর নিজের সম্পত্তি বলে মনে করেন না, পক্ষান্তরে তিনি সবকিছুই ভগবানের সেবায় সমর্পণ করেন। তার ফলে জীব ভগবদ্ভক্তের তত্ত্বাবধানে, ভগবদ্ভক্ত প্রভুর পরিচালনায় ভগবদুপলব্ধির সুযোগ প্রাপ্ত হয়।

গৃহস্থালীর প্রতি আসক্তি এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। একটি আসক্তি অন্ধকারের পথ এবং অন্যটি আলোকের পথ। যেখানে আলোক রয়েছে সেখানে অন্ধকার থাকতে পারে না, এবং যেখানে অন্ধকার সেখানে আলোকের অভাব। কিন্তু সুদক্ষ ভক্ত ভগবানের সেবাবৃত্তির মাধ্যমে সবকিছু আলোকের পথে নিয়ে যেতে পারেন, এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হচ্ছেন পাণ্ডবেরা। মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং তাঁর মতো গৃহস্থেরা তথাকথিত জড় বিষয়কে ভগবানের সেবায় যুক্ত করার মাধ্যমে সবকিছুই আলোকে পরিণত করতে পারেন। কিন্তু যারা যথাযথভাবে সে বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়নি অথবা সবকিছুই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করতে পারে না *(নিবন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে)*, তাদের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন করার যোগ্যতা লাভের জন্য সবরকম জড় সম্পর্ক ত্যাগ করা। অথবা বলা যায়, মহারাজ পরীক্ষিতের মতো যিনি অন্তত একদিনের জন্যও শুকদেব গোস্বামীর মতো

উপযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেছেন, তিনি সমস্ত জড় আসক্তি ত্যাগ করতে সক্ষম হতে পারেন। মহারাজ পরীক্ষিতের অনুকরণ করে শ্রীমদ্ভাগবত পেশাদারী পাঠকদের কাছে শ্রবণ করলে কোন লাভ হয় না, এমনকি তা যদি সাতশ' বছর ধরেও শ্রবণ করা হয়। পরিবারের ভরণপোষণের জন্য অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ নাম-প্রভুর চরণে সবচেয়ে গর্হিত অপরাধ (*সর্ব শুভ ক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ*)।

শ্লোক ৩-৪

পপ্রচ্ছ চেমমেবার্থং যন্মাং পৃচ্ছথ সত্তমাঃ।
কৃষ্ণানুভাব শ্রবণে শ্রদ্দধানো মহামনাঃ ॥ ৩ ॥
সংস্থাং বিজ্ঞায় সংন্যস্য কর্ম ত্রৈবর্গিকঞ্চ যৎ।
বাসুদেবে ভগবতি আত্মভাবং দৃঢ়ং গতঃ ॥ ৪ ॥

পপ্রচ্ছ—জিজ্ঞাসিত ; **চ**—ও ; **ইমম্**—এই ; **এব**—ঠিক যেমন ; **অর্থম্**—উদ্দেশ্য ; **যৎ**—যা ; **মাম্**—আমাকে ; **পৃচ্ছথ**—আপনি জিজ্ঞাসা করছেন ; **সত্তমাঃ**—হে মহান্ ঋষিগণ ; **কৃষ্ণ-অনুভাব**—শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন ; **শ্রবণে**—শ্রবণ করতে ; **শ্রদ্দধানঃ**—শ্রদ্ধায় পূর্ণ ; **মহামনাঃ**—মহাত্মা ; **সংস্থাম্**—মৃত্যু ; **বিজ্ঞায়**—জ্ঞাত হয়ে ; **সংন্যস্য**—ত্যাগ করে ; **কর্ম**—সকাম কর্ম ; **ত্রৈবর্গিকম্**—ধর্ম, অর্থ এবং কাম নামক তিনটি বর্গ ; **চ**—ও ; **যৎ**—যাই হোক ; **বাসুদেবে**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণে ; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান ; **আত্মভাবম্**—প্রেমের আকর্ষণ ; **দৃঢ়ম্**—অটল ; **গতঃ**—প্রাপ্ত হয়ে।

অনুবাদ

হে মহর্ষিগণ ! মহাত্মা মহারাজ পরীক্ষিৎ নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের ভাবনায় মগ্ন হয়ে, তাঁর মৃত্যু আসন্ন জেনে ধর্মানুষ্ঠান আদি সবরকম সকাম কর্ম, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধন সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক প্রেমকে আরও দৃঢ়ভাবে নিযুক্ত করেছিলেন, এবং আপনারা যেভাবে আমাকে প্রশ্ন করছেন ঠিক সেই সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

তাৎপর্য

জড় জগতে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রামরত বদ্ধ জীবেরা সাধারণত ধর্ম, অর্থ এবং কামের দ্বারা আকৃষ্ট। বেদে নির্দেশিত এই সমস্ত নিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপকে বলা হয় জীবনের কর্মকাণ্ডীয় ধারণা, এবং গৃহস্থদের সাধারণত এই সমস্ত বিধিগুলি অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয় ইহজীবনে এবং পরলোকে জাগতিক সুখভোগের জন্য। অধিকাংশ মানুষই এইপ্রকার কার্যকলাপের দ্বারা আকৃষ্ট। আধুনিক ভগবদ্বিহীন

সভ্যতায়ও মানুষ অর্থনৈতিক উন্নতি এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের চেষ্টায় অধিক ব্যস্ত, তবে তারা তা সাধন করার চেষ্টা করে স্বধর্মীয় চেতনাকে বাদ দিয়ে। সারা পৃথিবীর মহান্ সম্রাটরূপে পরীক্ষিৎ মহারাজকে বৈদিক কর্মকাণ্ডের এই সমস্ত বিধি নিষেধ পালন করতে হত, কিন্তু শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর ক্ষণিকের সঙ্গ প্রভাবে তিনি যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (বাসুদেব), যাঁর প্রতি তাঁর জন্মের সময় থেকে স্বাভাবিক প্রেম ছিল, তিনিই হচ্ছেন সবকিছু, এবং তাই তিনি বেদের কর্মকাণ্ডে নির্দেশিত সমস্ত কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে তাঁর মনকে দৃঢ়ভাবে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় স্থির করেছিলেন। জ্ঞানীরা বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর এই সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হন। মুক্তিকামী জ্ঞানীরা সকাম কর্মীদের থেকে সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ, এবং শত-সহস্র জ্ঞানীদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে একজন হয়ত মুক্ত হতে পারেন। এই প্রকার শত-সহস্র মুক্তদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে সমর্পিত আত্মা এবং ভক্ত দুর্লভ, যেকথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/১৯) শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঘোষণা করেছেন। এখানে *মহামনাঃ* শব্দটির দ্বারা মহারাজ পরীক্ষিতের বিশেষ যোগ্যতা বর্ণনা করা হয়েছে, যা তাঁকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত মহাত্মাদের সমপর্যায়ভুক্ত করেছে। পরবর্তীকালেও এই প্রকার বহু মহাত্মা আবির্ভূত হয়েছেন এবং তাঁরা সকলে সর্বপ্রকার কর্মকাণ্ডীয় ধারণা পরিত্যাগ করে সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়েছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর শিক্ষাষ্টকের অষ্টম শ্লোকে শিক্ষা দিয়েছেন—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্
অদর্শনান্ মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎ প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥

"বহু ভক্তের (রমণীর) প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ এই পাদরতা দাসীকে আলিঙ্গনকরুন অথবা পদদলিত করুন, অথবা দীর্ঘকাল দর্শন না দিয়ে মর্মাহত করুন, তথাপি তিনি আমার হৃদয়ের নাথ।"

শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—

বিরচয়ময়ী দণ্ডং দীনবন্ধো দয়ামী বা
গতিরিহ ন ভবত্তঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটিনির্ভরম্বা নবাম্ভঃ
তদপি কিলপয়োধঃ স্তুয়তে চাতকেন ॥

"হে দীনের নাথ! আপনি আমাকে নিয়ে যা করতে চান তাই করুন। আপনি যদি চান তা হলে আমার প্রতি আপনি কৃপা বর্ষণ করতে পারেন অথবা দণ্ডদান করতে পারেন, কিন্তু এই জগতে আপনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই; যেমন চাতক সর্বদা মেঘের প্রার্থনা করে, তা সে মেঘ বারিই বর্ষণ করুক অথবা বজ্রপাত করুক।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম গুরু শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ সমস্ত কর্মকাণ্ডীয় দায়-দায়িত্ব বিসর্জন দিয়ে এই কথাগুলি বলেছেন—

সন্ধ্যা-বন্দন ভদ্রমস্তু ভবতো ভোঃ স্নান তুভ্যং নমো
ভো দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্।
যত্রক্বাপি নিষদ্য যাদব-কুলোত্তমস্য কংস-দ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে কিমন্যেনমে ॥

"হে সন্ধ্যাবন্দনা, তোমার সর্বতোভাবে কল্যাণ হোক। হে প্রাতঃস্নান, আমি তোমাকে শুভ বিদায় জানাই। হে দেবগণ এবং পিতৃগণ, দয়া করে আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন, কেননা আমি আপনাদের প্রসন্নতার জন্য যোগ্য কার্য সম্পাদনে অক্ষম। আমি এখন কেবল সর্বত্র সর্বদা যদুকুলতিলক কংসারিকে (শ্রীকৃষ্ণকে) স্মরণ করার মাধ্যমে সমস্ত পাপের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হতে মনস্থ করেছি। আমি মনে করি এটিই যথেষ্ট। অতএব অন্য প্রচেষ্টা করার আর কি প্রয়োজন ?"

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী আরও বলেছেন—

মুগ্ধং মাং নিগদন্তু নীতিনিপুণা ভ্রান্তং মুহুর্বৈদিকাঃ
মন্দং বান্ধবসঞ্চয়া জড়ধীয়ং মুক্তাদরাঃ সোদরাঃ।
উন্মত্তং ধনিনো বিবেকচতুরাঃ কামস্মহাদাম্ভিকম্
মোক্তুং ন ক্ষামতে মনাগপি মনো গোবিন্দপাদস্পৃহাম্ ॥

"নীতিবাদীরা আমাকে মোহগ্রস্ত বলে নিন্দা করুক, তাতে আমি কিছু মনে করি না। বৈদিক কার্যকলাপে নিপুণ ব্যক্তিরা আমাকে পথভ্রষ্ট হয়েছি বলে বলুক, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবেরা আমাকে মন্দমতি বলে বলুক, আমার সহোদরেরা আমাকে মূর্খ বলে মনে করুক, ধনী ব্যক্তিরা আমাকে উন্মত্ত বলে মনে করুক এবং বিবেকচতুর দার্শনিকেরা আমাকে মহা দাম্ভিক বলে বিবেচনা করুক ; তথাপি শ্রীগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করার সংকল্প থেকে আমার মন বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না, যদিও আমি তা সম্পাদনে অক্ষম।"

প্রহ্লাদ মহারাজও বলেছেন—

ধর্মার্থকাম ইতি যোঽবিহিতাস্ত্রিবর্গ
ঈক্ষাত্রয়ী নয়দমৌ বিবিধা চ বার্তা।
মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং
স্বাত্মার্পণং স্ব-সুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ ॥

"ধর্ম, অর্থ এবং কাম, মোক্ষ-প্রাপ্তির তিনটি উপায় বলে বিবেচিত হয়। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে *ঈক্ষাত্রয়ী*, অর্থাৎ, আত্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞান, সকাম কর্মের জ্ঞান এবং তর্কবিদ্যা, রাজনীতি এবং অর্থনৈতিক জীবিকা-নির্বাহের বিভিন্ন উপায়। এই সমস্ত বৈদিক শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়, এবং তাই আমি সেইগুলিকে অনিত্য কার্যকলাপ বলে মনে করি।

পক্ষান্তরে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শরণাগতিই হচ্ছে জীবনের প্রকৃত লাভ, এবং তাকে আমি পরম সত্য বলে মনে করি।" *(ভাঃ ৭/৬/২৬)*

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (২/৪১) সমগ্র বিষয়কে *ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ* বা সিদ্ধিলাভের চরম পন্থা বলে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। মহান্ বৈষ্ণব আচার্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ, এটিকে *ভগবদর্চনা-রূপৈকনিষ্কাম-কর্মভি বিশুদ্ধ চিত্তঃ*—ভগবানের প্রেমময়ী সেবাকে, সকাম কর্মের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত, পরম কর্তব্য বলে স্বীকার করেছেন।

অতএব পরীক্ষিৎ মহারাজ যখন জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ডীয় ধারণাগুলি ত্যাগ করে ভগবানের চরণকমল দৃঢ়তাপূর্বক গ্রহণ করেছিলেন তা যথার্থই মঙ্গলজনক হয়েছিল।

শ্লোক ৫

রাজোবাচ

সমীচীনং বচোব্রহ্মন্ সর্বজ্ঞস্য তবানঘ।
তমো বিশীর্যতে মহ্যং হরেঃ কথয়তঃ কথাম্ ॥ ৫ ॥

রাজা উবাচ—রাজা বললেন ; **সমীচীনম্**—যথার্থ সত্য ; **বচঃ**—বাণী ; **ব্রহ্মন্**—হে বিদ্বান ব্রাহ্মণ ; **সর্বজ্ঞস্য**—যিনি সবকিছু জানেন ; **তব**—আপনার ; **অনঘ**—নিষ্পাপ ; **তমঃ**—অজ্ঞানের অন্ধকার ; **বিশীর্যতে**—ক্রমশ লুপ্ত হচ্ছে ; **মহ্যম্**—আমাকে ; **হরেঃ**—ভগবানের ; **কথয়তঃ**—যেভাবে আপনি বলছেন ; **কথাম্**—বিষয়।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন ঃ হে বিদ্বান ব্রাহ্মণ ! আপনি সবকিছুই জানেন, কেননা আপনি সবরকম জড় কলুষ থেকে মুক্ত। তাই আপনি আমাকে যা কিছু বলেছেন তা যথার্থই বলে প্রতীত হচ্ছে। আপনার বাণী ধীরে ধীরে আমার অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করছে, কেননা আপনি পরমেশ্বর ভগবানের কথা বর্ণনা করছেন।

তাৎপর্য

এখানে মহারাজ পরীক্ষিতের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে, যার ফলে বুঝতে পারা যায় যে, ভগবানের অপ্রাকৃত কথা যখন ঐকান্তিক ভক্ত জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে শ্রবণ করেন তখন তা ওষুধের মতো কাজ করে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কর্মকাণ্ডপরায়ণ শ্রোতারা যখন পেশাদারী ভাগবত পাঠকদের কাছ থেকে শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী শ্রবণ করে, তখন তা কখনোই অলৌকিকভাবে কার্য করে না, যা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের বাণীর ভক্তিপূর্ণ শ্রবণ সাধারণ বিষয়ের কথা শোনার মতো নয় ; তাই নিষ্ঠাপরায়ণ শ্রোতা, ক্রমশ অজ্ঞান-অন্ধকার দূরীভূত হওয়ার মাধ্যমে তার ফল অনুভব করতে পারবেন।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৬/২৩)

ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে যখন খেতে দেওয়া হয় তখন সে একসঙ্গে ক্ষুধা-নিবৃত্তি এবং আহারের তৃপ্তি অনুভব করতে পারে। তখন আর তাকে জিজ্ঞাসা করতে হয় না যে, তাকে সত্যি সত্যি খাওয়ানো হচ্ছে কিনা। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের যথার্থ ফল হচ্ছে যে, তার মাধ্যমে জীব জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়।

শ্লোক ৬

ভূয় এব বিবিৎসামি ভগবানাত্মমায়য়া।
যথেদং সৃজতে বিশ্বং দুর্বিভাব্যমধীশ্বরৈঃ ॥ ৬ ॥

ভূয়ঃ—পুনরায় ; **এব**—ও ; **বিবিৎসামি**—আমি জানতে চাই ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান ; **আত্ম**—নিজের ; **মায়য়া**—শক্তির দ্বারা ; **যথা**—যেমন ; **ইদম্**—এই বৈষয়িক জগৎ ; **সৃজতে**—সৃষ্টি করেন ; **বিশ্বম্**—ব্রহ্মাণ্ড ; **দুর্বিভাব্যম**—অচিন্ত্য ; **অধীশ্বরৈঃ**—মহান্ দেবতাদের দ্বারা।

অনুবাদ

আমি আপনার কাছে জানতে চাই পরমেশ্বর ভগবান কিভাবে তাঁর আত্মমায়ার দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, যা মহান্ দেবতাদের পক্ষেও দুর্বোধ্য।

তাৎপর্য

প্রতিটি জিজ্ঞাসু মনেই এই দৃশ্য জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রশ্নের উদয় হয়, এবং তাই মহারাজ পরীক্ষিতের মতো ব্যক্তির পক্ষে, যিনি তাঁর গুরুদেবের শ্রীমুখ থেকে পরমেশ্বর ভগবানের সমস্ত কার্যকলাপের কথা জানতে চেয়েছিলেন, এই প্রকার প্রশ্ন অস্বাভাবিক নয়। প্রতিটি অজ্ঞাত বিষয়ই আমাদের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে জানতে হয়। সৃষ্টি বিষয়ক প্রশ্নটিও এমন একটি প্রশ্ন যা যথার্থ ব্যক্তির কাছে অনুসন্ধান করার মাধ্যমে জানতে হয়। তাই এখানে শুকদেব গোস্বামী সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছে, সদ্‌গুরুকে অবশ্যই সর্বজ্ঞ হতে হবে। এইভাবে ভগবান সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রশ্ন যা শিষ্যের কাছে অজ্ঞাত তা যোগ্য গুরুর কাছ থেকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে জানতে হয়, এবং এখানে মহারাজ পরীক্ষিৎ তার ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ, ইতিমধ্যেই জানতেন যে আমরা যা কিছু দেখি তা সবই ভগবানের শক্তিসম্ভূত, যা আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতেই জানতে পেরেছি *(জন্মাদ্যস্য যতঃ)*। তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন। সৃষ্টির উৎস তাঁর জানা ছিল ; তা না হলে তিনি প্রশ্ন করতেন না কিভাবে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা এই

দৃশ্য জগৎ সৃষ্টি করেন। সাধারণ মানুষও জানে যে, কোনো সৃষ্টিকর্তা এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, আপনা থেকে তা সৃষ্টি হয়নি। এই ব্যবহারিক জগতে আমরা কোন কিছুই আপনা থেকে সৃষ্টি হতে দেখি না। মূর্খ মানুষেরা বলে যে, সৃজনী শক্তিও বৈদ্যুতিক শক্তির মতো স্বতন্ত্র এবং আপনা থেকেই কাজ করে। কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষেরা জানেন যে, বৈদ্যুতিক শক্তিও কোন সুদক্ষ কারিগরের দ্বারা শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে তৈরি হয়, এবং তারপর সেই শক্তি স্থানীয় কারিগরের তত্ত্বাবধানে সর্বত্র বিতরণ করা হয়। সৃষ্টি সম্পর্কে ভগবানের অধ্যক্ষতা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/৩০) উল্লেখ করা হয়েছে, এবং সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, জড়া প্রকৃতি ভগবানের অসংখ্য শক্তির মধ্যে একটি *(পরাস্য শক্তিরবিবিধৈব শ্রূয়তে)*। একজন অনভিজ্ঞ বালক তড়িৎ-শক্তির প্রভাবে সম্পাদিত স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক পদার্থবিদ্যার (ইলেকট্রনিক) নির্বিশেষ কার্যকলাপ এবং অন্যান্য অদ্ভুত কার্যকলাপ দেখে বিস্ময়ে হতবাক হতে পারে, কিন্তু একজন অভিজ্ঞ মানুষ জানেন যে, সেই সমস্ত কার্যকলাপের পিছনে রয়েছেন একজন সজীব মানুষ যিনি এই শক্তি সৃষ্টি করছেন। তেমনই এই পৃথিবীর তথাকথিত সমস্ত পণ্ডিত এবং দার্শনিকেরা তাদের মনের জল্পনা-কল্পনা এবং অনুমানের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের নির্বিশেষ সৃষ্টি সম্বন্ধে নানারকম অলীক মতবাদ উপস্থাপন করতে পারে, কিন্তু একজন বুদ্ধিমান ভগবদ্ভক্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করার মাধ্যমে জানতে পারেন যে, সৃষ্টির পিছনে ভগবানের হাত রয়েছে, ঠিক যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী শক্তি-কেন্দ্রে একজন পরিচালক রয়েছেন। গবেষক পণ্ডিতেরা সমস্ত কার্যের কারণ অনুসন্ধান করেন, কিন্তু ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাদের মতো গবেষক পণ্ডিতেরাও ভগবানের সৃষ্টি শক্তির অদ্ভুত কার্যকলাপ দর্শন করে মোহিত হন, অতএব ছোটখাটো বিষয় নিয়ে ব্যস্ত অতি ক্ষুদ্র জড় পণ্ডিতদের কি কথা!

ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন গ্রহে যেমন জীবেদের বসবাসের বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে, এবং একটি গ্রহ যেমন অন্য গ্রহটি থেকে শ্রেষ্ঠ, তেমনই সেই সমস্ত গ্রহের জীবেদের মস্তিষ্কের ক্ষমতাও ভিন্ন ভিন্ন স্তরের। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বর্ণনা অনুসারে আমরা জানতে পারি ব্রহ্মলোকের অধিবাসীদের জীবন কত দীর্ঘ। তা এই পৃথিবীর মানুষদের পক্ষে একপ্রকার অচিন্তনীয়, তেমনই এই গ্রহের বৈজ্ঞানিকদের কাছেও ব্রহ্মার মস্তিষ্কের ক্ষমতা অচিন্তনীয়। সেইরকম বিশাল মস্তিষ্কের ক্ষমতা সত্ত্বেও ব্রহ্মা তাঁর মহান্ সংহিতায় (*ব্রহ্ম-সংহিতা ৫/১*) বর্ণনা করেছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

"ভগবানের গুণাবলী সমন্বিত বহু ব্যক্তি রয়েছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম ঈশ্বর কেননা তাঁর থেকে বড় আর কেউ নেই। তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ এবং তাঁর দেহ সচ্চিদানন্দময়। তিনি হচ্ছেন আদি পুরুষ গোবিন্দ এবং সর্বকারণের পরম কারণ।"

ব্রহ্মাজী স্বীকার করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ। কিন্তু এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর ক্ষুদ্র মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষেরা মনে করে যে, ভগবান তাদেরই মতো একজন। তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন বলেন যে তিনিই হচ্ছেন সর্বেসর্বা, তখন মূঢ় দার্শনিক এবং জড়বাদী তার্কিকেরা তাঁর অবজ্ঞা করে। তাই ভগবান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/১১) দুঃখ করে বলেছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥

"আমি যখন মনুষ্যরূপে অবতরণ করি তখন মূর্খেরা আমার অবজ্ঞা করে। সর্বভূতের মহেশ্বররূপে আমার পরম ভাব তারা জানে না।" ব্রহ্মা এবং শিব (অন্যান্য দেবতাদের আর কি কথা) হচ্ছেন ভূত বা অত্যন্ত শক্তিশালী দেবতা, যাঁরা ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন, অনেকটা রাজা কর্তৃক নিযুক্ত মন্ত্রীদের মতো। মন্ত্রীরা ঈশ্বর হতে পারেন, বা নিয়ন্তা হতে পারেন, কিন্তু ভগবান হচ্ছেন মহেশ্বর বা সমস্ত ঈশ্বরদের স্রষ্টা। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা সে কথা জানে না, এবং তাই তিনি যখন তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে কখনো কখনো মনুষ্যরূপে অবতরণ করেন, তখন তারা তাঁকে অবজ্ঞা করার স্পর্ধা করে। ভগবান মানুষের মতো নন। তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ এবং পরম ঈশ্বর, এবং তাঁর দেহ এবং আত্মায় কোন পার্থক্য নেই। তিনি একাধারে শক্তি এবং শক্তিমান।

মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর গুরুদেব শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা বর্ণনা করতে অনুরোধ করেননি ; পক্ষান্তরে তিনি প্রথমে ভগবানের সৃষ্টি সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলেন। শুকদেব গোস্বামীও মহারাজ পরীক্ষিতকে প্রথমেই ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা-বিলাসের কথা শুনতে বলেননি। তখন সময় ছিল অত্যন্ত কম, এবং তাই শুকদেব গোস্বামী স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টিকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য সরাসরিভাবে দশম স্কন্ধের বর্ণনা করতে পারতেন, যা সাধারণত পেশাদারী পাঠকেরা করে থাকে। কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিৎ এবং শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা উভয়েই ভাগবত-সপ্তাহ আয়োজনকারীদের মতো এক লাফে ভগবানের গূঢ় লীলায় প্রবেশ করেননি ; তাঁরা উভয়েই সুসংবদ্ধভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন যাতে ভবিষ্যৎ পাঠক এবং শ্রোতারা তাঁদের সেই দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারে কিভাবে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করতে হয়।

ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তির দ্বারা যারা নিয়ন্ত্রিত, অর্থাৎ যারা জড় জগতে রয়েছে, সর্ব প্রথমে তাদের জানা উচিত কিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশনায় তাঁর বহিরঙ্গা-শক্তি কার্য করে, এবং তারপর ভগবানের অন্তরঙ্গা-শক্তির কার্যকলাপ জানা যেতে পারে। অধিকাংশ জড়বাদী দুর্গাদেবী বা ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তির পূজক, কিন্তু তারা জানে না যে, দুর্গাদেবী হচ্ছেন ভগবানের শক্তির ছায়া-স্বরূপা। তাঁর অত্যন্ত অদ্ভুত জড় কার্যকলাপ সম্পাদিত হয় ভগবানেরই নির্দেশনায়, যা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে। ব্রহ্ম-সংহিতাতেও বলা হয়েছে যে, দুর্গার শক্তি গোবিন্দের নির্দেশনায়

কার্য করে, এবং তাঁর অনুমোদন ব্যতীত অতি শক্তিশালী দুর্গা-শক্তি একটি তৃণকে পর্যন্ত সরাতে পারেন না। তাই কনিষ্ঠ ভক্তরা, এক লাফে ভগবানের অন্তরঙ্গা-শক্তি কর্তৃক আয়োজিত তাঁর অপ্রাকৃত লীলার স্তরে প্রবেশ করার চেষ্টা না করে তাঁর সৃষ্টি-শক্তির কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার মাধ্যমে ভগবানের মহত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত হওয়ার চেষ্টা করতে পারেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও সৃষ্টি শক্তির বর্ণনা এবং সৃষ্টি বিষয়ে ভগবানের হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের* রচয়িতা কনিষ্ঠ ভক্তদের ভগবানের মহিমা সম্বন্ধে জানতে অবহেলা করার বিপদের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন। কেউ যখন ভগবানের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তখনই কেবল তিনি অটল বিশ্বাস সহকারে একনিষ্ঠভাবে শ্রদ্ধাপরায়ণ হতে পারেন; তা না হলে মানব সমাজের মহান্ নেতারাও সাধারণ মানুষের মতো ভ্রান্তিবশত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে একজন দেবতা বা একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা রূপকথার নায়ক বলে মনে করতে পারেন। বৃন্দাবনে এমনকি দ্বারকায় ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাসমূহ অতি উন্নত পরমার্থবাদীরাও আস্বাদন করেন, আর সাধারণ মানুষেরা ভগবানের সেবা এবং ভগবান সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সেই স্তরে উন্নীত হতে পারে, যা আমরা পরীক্ষিৎ মহারাজের বেলায় দেখতে পাব।

শ্লোক ৭

যথা গোপায়তি বিভুর্যথা সংযচ্ছতে পুনঃ।
যাং যাং শক্তিমুপাশ্রিত্য পুরুশক্তিঃ পরঃ পুমান্।
আত্মানং ক্রীড়য়ন্ ক্রীড়ন্ করোতি বিকরোতি চ ॥ ৭ ॥

যথা—যেমন; **গোপায়তি**—পালন করেন; **বিভুঃ**—মহান; **যথা**—যেমন; **সংযচ্ছতে**—সংবরণ করেন; **পুনঃ**—পুনরায়; **যাম্ যাম্**—যেমন; **শক্তিম্**—শক্তি; **উপাশ্রিত্য**—নিয়োগ করে; **পুরুশক্তিঃ**—সর্বশক্তিমান; **পরঃ**—পরম; **পুমান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **আত্মানম্**—অংশ প্রকাশ; **ক্রীড়য়ন্**—তাদের নিযুক্ত করে; **ক্রীড়ন্**—এবং স্বয়ং নিযুক্ত হয়ে; **করোতি**—করেন; **বিকরোতি**—করা; **চ**—এবং।

অনুবাদ

দয়া করে আপনি বলুন সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান ক্রীড়াচ্ছলে তাঁর বিভিন্ন শক্তি এবং বিভিন্ন অংশদের কেমনভাবে এই জগতের পালন কার্যে এবং সংহার কার্যে নিযুক্ত করেন।

তাৎপর্য

কঠোপনিষদে (২/২/১৩) পরমেশ্বর ভগবানকে সমস্ত নিত্য জীবেদের মধ্যে পরম নিত্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে *(নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্)* এবং সেই

পরমেশ্বর ভগবান অসংখ্য অন্য সমস্ত জীবদের পালন করেন *(একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্)*। অতএব বদ্ধ এবং মুক্ত সমস্ত জীবদের সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান পালন করেন। ভগবান সেই পালন কার্য সম্পাদন করেন তাঁর বিভিন্ন প্রকাশ এবং অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা এবং তটস্থা নামক তিনটি প্রধান শক্তির মাধ্যমে। জীবেরা তাঁর তটস্থা শক্তি, এবং তাদের মধ্যে ব্রহ্মা, মরীচি আদি কয়েকজন বিশ্বস্ত জীবদের ভগবান অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে *(তেনে ব্রহ্ম হৃদা)* সৃষ্টি কার্যে নিযুক্ত করেন। বহিরঙ্গা (মায়া) শক্তির গর্ভে বদ্ধ জীবদের নিক্ষেপ করা হয়। আর মুক্ত তটস্থা শক্তিরা চিজ্জগতে সক্রিয় হয়, এবং ভগবান তাঁর বিভিন্ন অংশ-প্রকাশের দ্বারা চিদাকাশে তাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন অপ্রাকৃত সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে তাঁদের পালন করেন। এইভাবে এক পরমেশ্বর ভগবান বহুরূপে *(বহুস্যাম্)* নিজেকে প্রকাশ করেন। এইভাবে সমস্ত বৈচিত্র্য তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয়, এবং সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি প্রকাশিত হন, যদিও তিনি তাদের সকলের থেকে ভিন্ন। এইটি হচ্ছে ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি, এবং সবকিছুই একাধারে তাঁর সঙ্গে অচিন্ত্যরূপে ভিন্ন এবং অভিন্ন। *(অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব)*।

শ্লোক ৮

নূনং ভগবতো ব্রহ্মন্ হরেরদ্ভুতকর্মণঃ।
দুর্বিভাব্যমিবাভাতি কবিভিশ্চাপি চেষ্টিতম্ ॥ ৮ ॥

নূনম্—অপর্যাপ্ত ; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের ; **ব্রহ্মন্**—হে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের ; **অদ্ভুত**—আশ্চর্য ; **কর্মণঃ**—যিনি কর্মকরেন ; **দুর্বিভাব্যম্**—অচিন্ত্য ; **ইব**—সদৃশ ; **আভাতি**—পতিত হয় ; **কবিভিঃ**—অত্যন্ত বিদ্বান ব্যক্তিদের দ্বারাও ; **চ**—ও ; **অপি**—সত্ত্বেও ; **চেষ্টিতম্**—প্রয়াস করা সত্ত্বেও।

অনুবাদ

হে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ, পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ অত্যন্ত আশ্চর্যজনক, এবং তা অচিন্ত্য বলে মনে হয়, কেননা মহান্ পণ্ডিতদের মহতী প্রচেষ্টাও তা বোঝার জন্য পর্যাপ্ত নয়।

তাৎপর্য

এই একটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির ব্যাপারে ভগবানের কার্যকলাপ অচিন্ত্যরূপে অদ্ভুত বলে মনে হয়। আর এরকম অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, এবং তাদের সমষ্টিকে বলা হয় জড় জগৎ। আর এই জড় জগৎ ভগবানের সৃষ্টির একটি অংশ মাত্র *(একাংশেন স্থিতো জগৎ)*। যদি এই জড় জগতকে ভগবানের শক্তির এক অংশের প্রদর্শন বলে মনে করা হয়, তা হলে বাকি তিন অংশ হচ্ছে বৈকুণ্ঠ জগৎ বা চিজ্জগৎ, যাকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান *মদ্ধাম* বা সনাতন ধাম বলে বর্ণনা করেছেন। পূর্ববর্তী শ্লোকে আমরা লক্ষ্য

করেছি যে, ভগবান এই জগৎ সৃষ্টি করেন এবং পুনরায় তা গুটিয়ে নেন। এই ক্রিয়া কেবল জড় জগতের বেলাই হয়, কেননা অন্য জগতটি, যা ভগবানের সৃষ্টির বৃহত্তর অংশ, সেই বৈকুণ্ঠ লোকের কখনো সৃষ্টি হয় না ; এবং ধ্বংসও হয় না। তা যদি হত তা হলে বৈকুণ্ঠ ধামকে নিত্য বা সনাতন বলা হত না। ভগবান তাঁর ধামে বিরাজ করেন, এবং তাঁর নিত্য নাম, গুণ, লীলা, পরিকর এবং রূপ হচ্ছে তাঁর বিভিন্ন শক্তির প্রদর্শন এবং বিস্তার। ভগবানকে বলা হয় *অনাদি*, অর্থাৎ তাঁর কোন স্রষ্টা নেই এবং আদি, অর্থাৎ তিনি সবকিছুর উৎস। আমরা আমাদের ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে মনে করি যে ভগবানেরও সৃষ্টি হয়, কিন্তু বেদান্ত-শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে তাঁর কখনো সৃষ্টি হয় না। পক্ষান্তরে সবকিছুই তাঁর দ্বারা সৃষ্ট *(নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাৎ)*। তাই সাধারণ মানুষদের এই সমস্ত অদ্ভুত বিষয় বিচার করে দেখা উচিত। এই বিষয়টি বড় বড় পণ্ডিদেরও অচিন্ত্য, এবং তার ফলে এই সমস্ত পণ্ডিতেরা বিপরীত সিদ্ধান্তগুলি উপস্থাপন করে। এই বিশেষ ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে, যা হচ্ছে ভগবানের সৃষ্টির একটি নগণ্য অংশ, তাদের পুরোপুরি জ্ঞান নেই ; তারা জানে না এই আকাশ কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, অথবা সেখানে কত গ্রহ এবং নক্ষত্র রয়েছে, অথবা এই সমস্ত অসংখ্য গ্রহের পরিস্থিতি কিরকম। এই সমস্ত বিষয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। তাদের কেউ কেউ বলে যে আকাশে দশ কোটি গ্রহ রয়েছে। ১৯৬০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি মস্কোর একটি সংবাদে ঘোষণা করা হয়েছে—

"রাশিয়ার জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিখ্যাত অধ্যাপক বোরিস বোরোনৎসোভ ভেলিয়ামিনোভ বলেছেন যে ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য গ্রহ রয়েছে যেখানে বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী রয়েছে।"

"এমনও হতে পারে যে এই পৃথিবীর মতো প্রাণীরা সেই সমস্ত গ্রহে বিস্তার লাভ করছে।"

"রসায়ন বিজ্ঞানের ডঃ নিকোলাই জিরোভ অন্যান্য গ্রহের বায়ুমণ্ডলের সমস্যা নিয়ে আলোচনা সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে মঙ্গল গ্রহের প্রাণীরা দেহের নিম্ন তাপ সমন্বিত সাধারণ পরিস্থিতিতে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে।"

"তিনি বলেছেন যে তিনি মনে করেন যে মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডল সেই গ্রহের প্রাণীদের জীবন ধারণের জন্য উপযুক্ত।"

বিভিন্ন গ্রহের প্রাণীদের সেখানকার পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতার বর্ণনা করে ব্রহ্ম-সংহিতায় বলা হয়েছে *বিভূতি-ভিন্নম্* ; অর্থাৎ, এই ব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য গ্রহের প্রত্যেকটি গ্রহই বিশেষ ধরনের বায়ুমণ্ডল সমন্বিত এবং সেখানকার জীবেরা বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উন্নত, কেননা সেখানকার পরিবেশ এখানকার পরিবেশ থেকে অনেক ভাল। *বিভূতি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'বিশেষ শক্তি', আর *ভিন্নম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'বিবিধ'। যে সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা অন্তরীক্ষে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করছে এবং যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে অন্যান্য গ্রহে

যাওয়ার চেষ্টা করছে, তাদের অবশ্যই জেনে রাখা কর্তব্য যে, পৃথিবীর পরিবেশে বসবাসের উপযুক্ত প্রাণীরা অন্যান্য গ্রহের পরিবেশে থাকতে পারবে না। তাই বর্তমান শরীর ত্যাগ করার পর অন্য গ্রহে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য নিজেকে তৈরি করে নিতে হয়। যে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/২৫) বলা হয়েছে—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥

"যারা দেবতাদের উপাসনা করে, তারা দেবলোকে গমন করবে, যারা পিতৃদের পূজা করে, তারা পিতৃলোকে গমন করবে, যারা ভূতপ্রেতের পূজা করে, তারা প্রেতলোকে গমন করবে এবং যারা আমার আরাধনা করে, তারা আমাতে গতিলাভ করবে।"

ভগবানের সৃষ্টি শক্তির কার্যকলাপ সম্বন্ধে পরীক্ষিৎ মহারাজের উক্তি থেকে বোঝা যায় যে তিনি সৃষ্টি-তত্ত্ব সম্বন্ধে সবকিছু জানতেন। তা হলে কেন তিনি সেই সম্বন্ধে শুকদেব গোস্বামীকে প্রশ্ন করলেন? সারা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট, পাণ্ডবদের বংশধর এবং শ্রীকৃষ্ণের মহান্ ভক্ত পরীক্ষিৎ মহারাজ সৃষ্টি-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে সক্ষম ছিলেন, কিন্তু সেই জ্ঞান যথেষ্ট ছিল না। তাই তিনি বলেছেন যে মহান্ পণ্ডিতেরাও গভীর চেষ্টা করা সত্ত্বেও সে সম্বন্ধে জানতে অক্ষম। ভগবান অনন্ত এবং তাঁর কার্যকলাপও অপরিমেয়। এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ জীব ব্রহ্মা পর্যন্ত কেউই তাদের সীমিত জ্ঞানের সাহায্যে এবং ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সেই অনন্তকে জানার কল্পনা পর্যন্ত করতে পারে না। অনন্ত যখন নিজেকে জানান, যা তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তাঁর অতুলনীয় বর্ণনার মাধ্যমে করেছেন, তখনই কেবল আমরা অনন্ত সম্বন্ধে কিছু জানতে পারি। আবার সেই জ্ঞান শুকদেব গোস্বামীর মতো আত্মতত্ত্ববেত্তা পুরুষের কাছ থেকেও কিছু পরিমাণে লাভ করা যায়, যিনি সেই জ্ঞান লাভ করেছিলেন নারদ মুনির শিষ্য ব্যাসদেবের কাছ থেকে। এইভাবে গুরু পরম্পরার ধারাতে এই পূর্ণজ্ঞান প্রবাহিত হয়। কোন প্রকার ব্যবহারিক জ্ঞানের দ্বারা তা জানা যায় না, তা সে প্রাচীনই হোক বা আধুনিকই হোক।

শ্লোক ৯

যথা গুণাংস্তু প্রকৃতের্যুগপৎ ক্রমশোঽপি বা।
বিভর্তি ভূরিশস্ত্বেকঃ কুর্বন্ কর্মাণি জন্মভিঃ ॥ ৯ ॥

যথা—যেমন; **গুণান্**—প্রকৃতির গুণ; **তু**—কিন্তু; **প্রকৃতেঃ**—জড়া প্রকৃতির; **যুগপৎ**—একসাথে; **ক্রমশঃ**—ধীরে ধীরে; **অপি**—ও; **বা**—অথবা; **বিভর্তি**—পালন করে; **ভূরিশঃ**—বিবিধ রূপ; **তু**—কিন্তু; **একঃ**—পরম পুরুষ; **কুর্বন্**—কার্য করে; **কর্মাণি**—কার্যকলাপ; **জন্মভিঃ**—অবতারদের দ্বারা।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান এক, তা তিনি একলাই প্রকৃতির গুণের দ্বারা কার্য করুন, অথবা যুগপৎ বহুরূপে নিজেকে বিস্তার করুন অথবা প্রকৃতির গুণসমূহ পরিচালনা করার জন্য ক্রমশ নিজেকে বিস্তার করুন।

শ্লোক ১০

বিচিকিৎসিতমেতন্মে ব্রবীতু ভগবান্ যথা।
শাব্দে ব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরস্মিংশ্চ ভবান্ খলু ॥ ১০ ॥

বিচিকিৎসিতম্—সন্দেহপূর্ণ প্রশ্ন; **এতৎ**—এই; **মে**—আমার; **ব্রবীতু**—পরিষ্কার করে; **ভগবান্**—ভগবানের মতো শক্তিশালী; **যথা**—যতখানি; **শাব্দে**—দিব্য শব্দে; **ব্রহ্মণি**—বৈদিক শাস্ত্র; **নিষ্ণাতঃ**—পূর্ণরূপে উপলব্ধি; **পরস্মিন্**—চিন্ময় স্তরে; **চ**—ও; **ভবান্**—আপনি; **খলু**—বাস্তবিকভাবে।

অনুবাদ

দয়া করে আপনি আমার সমস্ত সন্দেহের নিরসন করুন। আপনি কেবল বৈদিক শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন এবং আত্মতত্ত্ববেত্তাই নন, আপনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একজন মহান্ ভক্ত এবং তাই আপনি ভগবানেরই সমান।

তাৎপর্য

ব্রহ্ম-সংহিতায় বলা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দ একএবং অদ্বিতীয় হওয়া সত্ত্বেও অনন্ত অচ্যুতরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন এবং সেই সমস্ত প্রকাশগুলি পরস্পর থেকে অভিন্ন। যদিও তিনি আদিপুরুষ তথাপি তাঁর রূপ নিত্য নবযৌবনসম্পন্ন। বেদের অপ্রাকৃত বিজ্ঞানের মাধ্যমেও তাঁকে জানা দুর্লভ, কিন্তু তাঁর শুদ্ধ ভক্তেরা তাঁকে অনায়াসে জানতে পারেন।

ভগবানের বিভিন্ন প্রকাশ, যেমন কৃষ্ণ থেকে বলদেব, বলদেব থেকে সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ থেকে বাসুদেব, বাসুদেব থেকে অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধ থেকে প্রদ্যুম্ন, এবং তাঁর থেকে আবার দ্বিতীয় সঙ্কর্ষণ, এবং তাঁর থেকে নারায়ণ পুরুষাবতার এবং অন্যান্য অসংখ্য রূপ, যাঁদের নিত্য প্রবহমান নদীর অসংখ্য তরঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তাঁরা সকলেই এক এবং অভিন্ন। তাঁরা সমান শক্তিসম্পন্ন দীপের মতো, যেগুলি অন্য একটি দীপ থেকে প্রজ্বলিত হয়েছে। এটি ভগবানের অপ্রাকৃত শক্তি। বেদে বলা হয়েছে যে তিনি এমনই পূর্ণ যে তাঁর থেকে পূর্ণশক্তিসম্পন্ন আর একজন প্রকাশিত হলেও তিনি পূর্ণরূপেই বর্তমানে থাকেন *(পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে)*। অতএব জ্ঞানীদের ভগবানের সম্বন্ধে মনোধর্মপ্রসূত ভৌতিক ধারণার কোনই ভিত্তি নেই। তাই জড়বাদী পণ্ডিতদের কাছে, তা তিনি যদি বৈদিক শাস্ত্রে মহাপণ্ডিতও হন,

তথাপি ভগবানের পরিচয় তার কাছে সর্বদাই রহস্যাবৃত থাকবে *(বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ)*। তাই ভগবান জাগতিক পণ্ডিত, দার্শনিক অথবা বৈজ্ঞানিকদের বিচার-বুদ্ধির অতীত। অথচ তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের কাছে তিনি সহজেই প্রকাশিত হন, কেননা ভগবান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮/৫৪) ঘোষণা করেছেন যে জ্ঞানের স্তর অতিক্রম করে ভক্তি সহকারে তাঁর প্রতি সেবাপরায়ণ হলে কেবল তখনই তাঁকে যথাযথভাবে জানা সম্ভব হয়। ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত না হলে ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, লীলা, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে জানা সম্ভব নয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮/৬৬) যে বলা হয়েছে, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*, তার অর্থ হচ্ছে এই যে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হতে হবে। তাহলেই কেবল সেই ভক্তির বলে ভগবানকে জানা যেতে পারে।

পূর্ববর্তী শ্লোকে মহারাজ পরীক্ষিৎ স্বীকার করেছেন যে ভগবান সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদেরও চিন্তার অতীত। তাহলে কেন তিনি শুকদেব গোস্বামীকে অনুরোধ করেছেন ভগবান সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান স্পষ্টরূপে প্রকাশিত করতে ? তার কারণটি সহজেই বোধগম্য। শুকদেব গোস্বামী বৈদিক তত্ত্বজ্ঞানের মহান পণ্ডিতই কেবল ছিলেন না, তিনি ছিলেন তত্ত্বদ্রষ্টা মহান ভগবদ্ভক্তও। ভগবানের কৃপায় ভগবানের শক্তিশালী ভক্ত ভগবানের থেকেও অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন হন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে সাগর অতিক্রম করে লঙ্কার দ্বীপে যাওয়ার জন্য সেতু বন্ধন করতে হয়েছিল, কিন্তু হনুমানজী, তাঁর শুদ্ধ ভক্ত, লাফ দিয়ে সমুদ্র অতিক্রম করেছিলেন। ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তের প্রতি এতই করুণাময় যে তিনি তাঁর প্রিয় ভক্তকে তাঁর থেকেও অধিক শক্তিশালী রূপে উপস্থাপন করেন। দুর্বাসা মুনি এতই ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন যে ভৌতিক অবস্থাতে থাকা সত্ত্বেও তিনি সরাসরিভাবে ভগবানের কাছে যেতে পারতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবান তাঁকে রক্ষা করার ব্যাপারে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত মহারাজ অম্বরীষ তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। অতএব ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের থেকে অধিক ক্ষমতাসম্পন্নই কেবল নন, ভগবানের ভক্তের পূজা সরাসরিভাবে ভগবানের পূজার থেকেও অধিক কার্যকরী বলে বিবেচনা করা হয়েছে *(মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা)*।

অতএব চরমে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ঐকান্তিক ভক্তের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে সদ্গুরুর শরণাগত হওয়া, যিনি কেবল বৈদিক শাস্ত্র সম্বন্ধে পারদর্শীই নন, অধিকন্তু ভগবান এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তি সম্বন্ধে পরম উপলব্ধ বা তত্ত্বদ্রষ্টা। এই প্রকার ভক্ত-গুরুর সাহায্য ব্যতীত ভগবত্তত্ত্ব উপলব্ধির পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। আর শুকদেব গোস্বামীর মতো আদর্শ সদ্গুরু কেবল ভগবানের অন্তরঙ্গা-শক্তি সম্বন্ধেই উপদেশ দেন না, পক্ষান্তরে ভগবান কিভাবে তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির সঙ্গ করেন তাও বিশ্লেষণ করেন।

অন্তরঙ্গা-শক্তিতে ভগবানের কার্যকলাপ প্রকাশিত হয় তাঁর বৃন্দাবন-লীলায়, কিন্তু তাঁর বহিরঙ্গা-শক্তির কার্যকলাপ পরিচালিত হয় কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু রূপের মাধ্যমে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উৎসাহী বৈষ্ণবদের সদুপদেশ দেওয়ার প্রসঙ্গে বলেছেন যে তাদের কেবল ভগবানের লীলা (যেমন রাসলীলা) শ্রবণেই উৎসাহী হওয়া উচিত নয়, পক্ষান্তরে পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো আদর্শ শিষ্য এবং শুকদেব গোস্বামীর মতো আদর্শ গুরুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পুরুষাবতাররূপে ভগবানের সৃষ্টি-তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রবণ করতেও গভীরভাবে আগ্রহী হওয়া উচিত।

শ্লোক ১১

সূত উবাচ

ইত্যুপামন্ত্রিতো রাজ্ঞা গুণানুকথনে হরেঃ।
হৃষীকেশমনুস্মৃত্য প্রতিবক্তুং প্রচক্রমে ॥ ১১ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন ; **ইতি**—এইভাবে ; **উপামন্ত্রিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে ; **রাজ্ঞা**—রাজা কর্তৃক ; **গুণ-অনুকথনে**—অপ্রাকৃত গুণও লীলাবিলাস বর্ণনে ; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের ; **হৃষীকেশম্**—ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের ; **অনুস্মৃত্য**—যথাযথভাবে স্মরণ করে ; **প্রতিবক্তুম্**—উত্তর দেবার জন্য ; **প্রচক্রমে**—প্রস্তুতিমূলক কার্যকলাপ সম্পাদন করেছিলেন।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন, রাজা কর্তৃক এইভাবে ভগবানের সৃজনাত্মক শক্তি বর্ণনা করতে প্রার্থিত হয়ে শুকদেব গোস্বামী সর্বেন্দ্রিয় পতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে প্রত্যুত্তর দিতে শুরু করলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তরা যখন পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য গুণাবলী বর্ণনা করে ভাষণ দেন, তখন তাঁরা মনে করেন না যে তাঁরা স্বতন্ত্রভাবে কিছু করতে পারেন। তাঁরা মনে করেন যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পতি পরমেশ্বর ভগবান হৃষীকেশ তাঁদের দিয়ে যা বলান তাই কেবল তারা বলতে পারেন। জীবের ইন্দ্রিয়গুলি প্রকৃতপক্ষে তাদের নয়। ভগবদ্ভক্ত জানেন যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং সেগুলির যথাযথ উপযোগ তখনই সম্ভব হয় যখন তারা পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়। ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে যন্ত্র এবং পঞ্চমহাভূত হচ্ছে উপাদান এবং সে সমস্তই ভগবান কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে। তাই মানুষ যা কিছু করে, বলে, দেখে, তা সবই ভগবানের পরিচালনায় সম্পাদিত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) সে কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে, *সর্বস্য*

চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃস্মৃতির্জ্ঞানমপহনঞ্চ। কেউই স্বতন্ত্রভাবে কার্য করতে পারে না, এবং তাই কর্ম করার জন্য, খাওয়ার জন্য অথবা কিছু বলার জন্য সর্বদাই ভগবানের অনুমতি গ্রহণ করা প্রয়োজন, এবং ভগবানের আশীর্বাদ সহকারে ভক্ত যা কিছু করেন তা সবই বদ্ধ জীব কর্তৃক কৃত কর্মের চারটি স্বাভাবিক দোষ থেকে মুক্ত।

শ্লোক ১২

শ্রীশুক উবাচ

নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় ভূয়সে
সদুদ্ভবস্থাননিরোধলীলয়া।
গৃহীতশক্তিত্রিতয়ায় দেহিনা-
মন্তর্ভবায়ানুপলক্ষ্যবর্ত্মনে ॥ ১২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রী শুকদেব গোস্বামী বললেন ; **নমঃ**—নমস্কার করে ; **পরস্মৈ**—পরম ; **পুরুষায়**—ভগবানকে ; **ভূয়সে**—পরম পূর্ণকে ; **সদুদ্ভব**—জড় জগতের সৃষ্টি ; **স্থান**—তার পালন ; **নিরোধ**—এবং তার সংহার ; **লীলয়া**—লীলার দ্বারা ; **গৃহীত**—গ্রহণ করে ; **শক্তি**—শক্তি ; **ত্রিতয়ায়**—ত্রিগুণ ; **দেহিনাম্**—সমস্ত দেহধারীদের ; **অন্তর্ভবায়**—যিনি অন্তরে বিরাজ করেন ; **অনুপলক্ষ্য**—অচিন্ত্য ; **বর্ত্মনে**—এমনই যাঁর কার্যকলাপ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন ঃ আমি সেই ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি, যিনি জড় জগতের সৃষ্টির জন্য প্রকৃতির তিনটি গুণ অঙ্গীকার করেন। তিনি প্রতিটি জীবের শরীরে বিরাজমান পরম পূর্ণ এবং তাঁর কার্যকলাপ অচিন্ত্য।

তাৎপর্য

এই জড় জগৎ সত্ত্ব, রজো এবং তমো এই তিনটি গুণের প্রকাশ, এবং পরমেশ্বর ভগবান এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্কর (শিব) এই তিনটি মুখ্য রূপ স্বীকার করেন। বিষ্ণুরূপে তিনি জড় জগতের প্রতিটি সৃষ্টিতে প্রবেশ করেন। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে তিনি প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন, এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে তিনি প্রতিটি জীবের শরীরে প্রবেশ করেন। সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বের উৎস হওয়ার ফলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এখানে *পরঃ পুমান্* বা *পুরুষোত্তম* বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যেভাবে তাঁকে শ্রীমদ্ভবদ্গীতায়ও (১৫/১৮) বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি পরম পূর্ণ। তাই পুরুষাবতারেরা হচ্ছেন তাঁর অংশ প্রকাশ। ভক্তিযোগই হচ্ছে একমাত্র পন্থা, যার মাধ্যমে তাঁকে জানা যায়। যেহেতু জ্ঞানী এবং যোগীরা পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে না, তাই তাঁকে *অনুপলক্ষ্যবর্ত্মনে* বলা হয়েছে, অর্থাৎ ভগবানের কার্যকলাপ অচিন্ত্য। ভক্তিযোগের মাধ্যমেই কেবল তাঁকে জানা সম্ভব।

শ্লোক ১৩

ভূয়ো নমঃ সদ্বৃজিনচ্ছিদেঽসতা-
মসম্ভবায়াখিলসত্ত্বমূর্তয়ে।
পুংসাং পুনঃ পারমহংস্য আশ্রমে
ব্যবস্থিতানামনুমৃগ্যদাশুষে ॥ ১৩ ॥

ভূয়ঃ—পুনরায়; **নমঃ**—আমার প্রণতি; **সৎ**—ভগবদ্ভক্ত বা পুণ্যবানদের; **বৃজিন**—দুর্দশাগ্রস্তদের; **ছিদে**—মুক্তিদাতা; **অসতাম্**—নাস্তিক বা অভক্ত অসুরদের; **অসম্ভবায়**—সংকট মোচন; **অখিল**—পূর্ণ; **সত্ত্ব**—সত্ত্বগুণ; **মূর্তয়ে**—পরম পুরুষকে; **পুংসাম্**—পরমার্থবাদীদের; **পুনঃ**—পুনরায়; **পারমহংস্যে**—পারমার্থিক সিদ্ধির চরম স্তর; **আশ্রমে**—পদে; **ব্যবস্থিতানাম্**—বিশেষভাবে স্থিত; **অনুমৃগ্য**—গন্তব্যস্থল; **দাশুষে**—উদ্ধারকর্তা।

অনুবাদ

আমি পুনরায় পূর্ণ অস্তিত্ব এবং অধ্যাত্ম রূপ সমন্বিত পরমেশ্বর ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি পুণ্যবান ভক্তদের সমস্ত সংকট থেকে উদ্ধার করেন এবং অভক্ত অসুরদের নাস্তিক মনোবৃত্তি বৃদ্ধিতে বাধা দেন। পারমার্থিক সিদ্ধির সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত পরমহংসদের তিনি বিশিষ্টপদ দান করেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ জড় এবং চেতন উভয় জগতেরই সমস্ত অস্তিত্বের পূর্ণ প্রকাশ। *অখিল* শব্দের অর্থ হচ্ছে পূর্ণ অথবা যা *খিল* বা নিকৃষ্ট নয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে প্রকৃতি দুই প্রকার, যথা জড়া এবং পরা, অথবা ভগবানের অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা শক্তি। জড় জগতকে বলা হয় অপরা বা নিকৃষ্ট প্রকৃতি এবং চিজ্জগতকে বলা হয় পরা বা উৎকৃষ্ট প্রকৃতি। তাই ভগবানের রূপ নিকৃষ্ট জড়া-প্রকৃতিসম্ভূত নয়। তিনি পূর্ণ চিন্ময়, এবং তাঁর মূর্তি বা অপ্রাকৃত রূপ রয়েছে। যে সমস্ত অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা তাঁর অপ্রাকৃত রূপ সম্বন্ধে অবগত নয়, তারা তাঁকে নির্বিশেষ ব্রহ্ম বলে বর্ণনা করে। কিন্তু ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে কেবল তাঁর অপ্রাকৃত দেহ নির্গত রশ্মিচ্ছটা *(যস্য প্রভা)*। তাঁর অপ্রাকৃত রূপ সম্বন্ধে অবগত ভগবদ্ভক্তেরা তাঁর সেবা করেন, এবং ভগবানও তাঁর অহৈতুকী করুণার প্রভাবে তাঁদের সেই সেবার প্রতিদান দেন এবং তার ফলে তাঁর ভক্তেরা সমস্ত ক্লেশ থেকে মুক্ত হন। যে সমস্ত পুণ্যবান ব্যক্তিরা বেদের বিধান অনুসরণ করেন, তাঁরাও তাঁর প্রিয়, এবং তাই এই জগতের পুণ্যবান মানুষদেরও তিনি রক্ষা করেন। পাপী এবং অভক্তেরা বৈদিক অনুশাসনের বিরোধী, এবং তাই ভগবান তাদের নিন্দনীয় কার্যকলাপের প্রগতিতে বাধা প্রদান করেন। তাদের মধ্যে যারা

বিশেষভাবে ভগবানের কৃপা লাভ করে, তারা ভগবান কর্তৃক নিহত হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ রাবণ, হিরণ্যকশ্যিপু এবং কংসের নাম উল্লেখ করা যায়। এইভাবে ভগবান কর্তৃক নিহত হওয়ার ফলে এই সমস্ত অসুরেরা মুক্তি লাভ করে এবং তার ফলে তাদের আসুরিক কার্যকলাপের প্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। তিনি তাঁর ভক্তদের কৃপা করুন অথবা অসুরদের দণ্ড দান করুন, ভগবান সর্ব অবস্থাতেই একজন স্নেহময় পিতার মতো সকলের প্রতি কৃপাপরায়ণ, কেননা তিনি সমস্ত অস্তিত্বের পূর্ণ প্রকাশ।

পারমার্থিক জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধ অবস্থা হচ্ছে পরমহংস স্তর। শ্রীমতী কুন্তীদেবীর মতে পরমহংসরাই কেবল যথাযথভাবে ভগবানকে জানতে পারেন। চিন্ময় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গমের ব্যাপারে যেমন নির্বিশেষ ব্রহ্ম থেকে অন্তর্যামী পরমাত্মা, তারপর ক্রমে ক্রমে সবিশেষ ভগবান, পুরুষোত্তম, শ্রীকৃষ্ণকে জানার স্তর রয়েছে, তেমনই পারমার্থিক জীবনের সন্ন্যাস আশ্রমেও মানুষের ক্রমশ পারমার্থিক উন্নতির স্তর রয়েছে। সন্ন্যাস আশ্রমের সেই ক্রমোন্নতির স্তরগুলি হচ্ছে কুটীচক, বহূদক, পরিব্রাজক এবং পরমহংস। পাণ্ডবদের জননী শ্রীমতী কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর প্রার্থনায় (প্রথম স্কন্ধ, অষ্টম অধ্যায়) সে কথা বলেছেন। সাধারণত নির্বিশেষবাদী এবং ভক্ত উভয়ের মধ্যেই পরমহংস দেখা যায়, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা অনুসারে (যা কুন্তীদেবী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন) শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি পরমহংসেরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, এবং কুন্তীদেবী বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে ভগবান পরমহংসদের ভক্তিযোগ দান করার জন্য বিশেষভাবে অবতরণ করেন *(পরিত্রাণায় সাধূনাম্)*। অতএব চরমে পরমহংস বলতে ভগবানের অনন্য ভক্তদেরই বোঝায়। শ্রীল জীব গোস্বামী সরাসরিভাবে স্বীকার করেছেন যে জীবের পরম গতি হচ্ছে ভক্তিযোগ যার দ্বারা ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া যায়। যাঁরা ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করেছেন তাঁরাই প্রকৃত পরমহংস।

ভগবান যেহেতু সকলের প্রতি অত্যন্ত কৃপাময়, তাই যে সমস্ত নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার জন্য ভক্তির পন্থা অবলম্বন করে তাদেরও তিনি তাদের বাঞ্ছিত লক্ষ্য প্রদান করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৪/১১) তিনি সকলকে আশ্বাস দিয়েছেন—*যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে*। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে দুই প্রকার পরমহংস রয়েছেন, যথা ব্রহ্মানন্দী (নির্বিশেষবাদী) এবং প্রেমানন্দী (ভগবদ্ভক্ত), এবং প্রেমানন্দীরা যদিও ব্রহ্মানন্দীদের থেকে অধিক ভাগ্যবান, তথাপি উভয়েরই বাঞ্ছিত লক্ষ্য প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মানন্দী এবং প্রেমানন্দী উভয়েই পরমার্থবাদী, এবং জড় জীবনের দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ নিকৃষ্ট জড়া প্রকৃতির সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই।

শ্লোক ১৪

নমো নমস্তেঽস্ত্বৃষভায় সাত্বতাং
বিদূরকাষ্ঠায় মুহুঃ কুযোগিনাম্।

নিরস্তসাম্যাতিশয়েন রাধসা
স্বধামনি ব্রহ্মণি রংস্যতে নমঃ ॥ ১৪ ॥

নমঃ নমস্তে—আমি আপনাকে আমার স্বশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি; **অস্তু**—হয়; **ঋষভায়**—মহান পার্ষদকে; **সাত্বতাম্**—যদু বংশের সদস্যদের; **বিদূরকাষ্ঠায়**—জড় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের থেকে যিনি অনেক দূরে থাকেন; **মুহুঃ**—সর্বদা; **কুযোগিনাম্**—অভক্তদের; **নিরস্ত**—বিনাশ করে; **সাম্য**—সমান পদ; **অতিশয়েন**—মহানতার দ্বারা; **রাধসা**—ঐশ্বর্যের দ্বারা; **স্বধামনি**—তাঁর স্বীয় ধামে; **ব্রহ্মণি**—চিদাকাশে; **রংস্যতে**—উপভোগ করেন; **নমঃ**—আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

যদুবংশীয়দের পার্ষদ এবং অভক্তদের যিনি সর্বদা সমস্যার সৃষ্টি করেন তাঁকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। তিনি জড় এবং চেতন উভয় জগতেরই পরম ভোক্তা, তথাপি তিনি চিদাকাশে তাঁর লীলাবিলাস করেন। কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়, কেননা তাঁর অপ্রাকৃত ঐশ্বর্য অনন্ত এবং অসীম।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রকাশের দুটি দিক রয়েছে। তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের তিনি নিত্য সঙ্গী, যেমন যদুকুলে আবির্ভূত হয়ে তিনি যাদবদের তাঁর সঙ্গ দান করেছিলেন; অথবা সখারূপে অর্জুনকে, অথবা নন্দ-যশোদার পুত্ররূপে বৃন্দাবনে ব্রজবাসীদের প্রতিবেশীরূপে সঙ্গ দান করেছিলেন, সুদাম, শ্রীদাম এবং মধুমঙ্গলকে সখা রূপে তাঁর সঙ্গদান করেছিলেন অথবা ব্রজগোপিকাদের প্রেমিক রূপে সঙ্গ দান করেছিলেন। এটি তাঁর সবিশেষরূপের একটি প্রকাশ। আর নির্বিশেষরূপে তিনি অন্তহীন এবং সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্মজ্যোতিরূপে নিজেকে বিস্তার করেন। সূর্যের আলোকের সঙ্গে যাঁর তুলনা করা যায়, সেই সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্মজ্যোতির একটি অংশ মহত্তত্ত্বের অন্ধকারের দ্বারা আচ্ছাদিত, এবং সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন নগণ্য অংশটি হচ্ছে জড় জগৎ। এই জড় জগতে আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের মতো অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, এবং সেই প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে আমাদের এই পৃথিবীর মতো শত সহস্র গ্রহ রয়েছে। জড়বাদীরা ভগবানের রশ্মিচ্ছটার অন্তহীন প্রকাশ দ্বারা মোহিত, কিন্তু ভক্তেরা তাঁর সবিশেষরূপের প্রতি আসক্ত, যার থেকে সবকিছু প্রকাশিত হয়েছে *(জন্মাদ্যস্য যতঃ)*। সূর্যকিরণ যেমন সূর্যমণ্ডলে ঘনীভূত রয়েছে, তেমনই ব্রহ্মজ্যোতি চিদাকাশের সর্বোচ্চ লোক গোলোক বৃন্দাবনে কেন্দ্রীভূত। জড় আকাশের অনেক অনেক ঊর্ধ্বে অন্তহীন চিদাকাশ বৈকুণ্ঠ নামক চিন্ময় গ্রহে পূর্ণ। জড়বাদীদের জড় আকাশ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান নেই, অতএব চিদাকাশ সম্বন্ধে তারা কি ধারণা করতে পারে? তাই জড়বাদীরা সর্বদাই তাঁর থেকে অনেক অনেক দূরে অবস্থিত। ভবিষ্যতে তারা যদি বায়ুর গতিতে অথবা মনের গতিতে

ভ্রমণ করতে সক্ষম কোন যন্ত্র তৈরি করতে পারেও, তথাপি জড়বাদীরা চিদাকাশের গ্রহগুলিতে যাওয়া তো দূরের কথা, তাদের সম্বন্ধে কল্পনা পর্যন্ত করতে পারবে না। তাই ভগবান এবং তাঁর ধাম চিরকালই তাদের কাছে রহস্যাবৃত থাকবে অথবা তা রূপকথা বলে মনে হবে। কিন্তু ভক্তদের কাছে ভগবান সর্বদাই তাদের সঙ্গীরূপে সহজলভ্য।

চিদাকাশে তাঁর ঐশ্বর্য অসীম। অনন্তরূপে নিজেকে বিস্তার করে ভগবান তাঁর নিত্যমুক্ত ভক্তপার্ষদদের নিয়ে অসংখ্য বৈকুণ্ঠলোকে বিরাজ করেন। কিন্তু যে সমস্ত নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের অস্তিত্বে লীন হয়ে যেতে চায়, তারা চরমে ব্রহ্মজ্যোতির একটি চিৎস্ফুলিঙ্গে লীন হতে পারে। বৈকুণ্ঠলোকে অথবা ভগবানের পরমধাম গোলোক বৃন্দাবনে ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করার কোন যোগ্যতা তাদের নেই। এই বৈকুণ্ঠ এবং গোলোক বৃন্দাবনের বর্ণনা করে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন *মদ্ধাম*, এবং এখানে এই শ্লোকটিতেও তাদের ভগবানের *স্বধাম* বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

মদ্ধাম বা স্বধামের বর্ণনা করে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৫/৬) বলা হয়েছে—

ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥

ভগবানের স্বধামকে আলোকিত করার জন্য সূর্যকিরণ অথবা চন্দ্রকিরণ অথবা বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় না। তাঁর সেই স্থান হচ্ছে সর্বোচ্চ, এবং সেখানে একবার গেলে আর কখনো এই জড় ফিরে আসতে হয় না।

বৈকুণ্ঠলোক এবং গোলোক বৃন্দাবন জ্যোতির্ময় এবং ভগবানের সেই স্বধাম থেকে যে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয় তা হচ্ছে ব্রহ্মজ্যোতি। *মুণ্ডক উপনিষদ (২/২/১০), কঠোপনিষদ (২/২/১৫), শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (৬/১৪)* আদি বৈদিক শাস্ত্রে তা প্রতিপন্ন হয়েছে—

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়ম অগ্নিঃ।
তমেব ভান্তম্ অনু ভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বম্ ইদং বিভাতি॥

ভগবানের সেই স্বধামকে আলোকিত করার জন্য সূর্য, চন্দ্র অথবা তারকার প্রয়োজন হয় না। সেখানে বিদ্যুতেরও প্রয়োজন হয় না, সুতরাং দীপের আলোকের কি কথা? পক্ষান্তরে যেহেতু সেগুলি জ্যোতির্ময় তাই সে জগৎ পূর্ণ আলোকে উদ্ভাসিত, এবং সেই স্বধামের জ্যোতির প্রভাবে সেখানে সবকিছুই জ্যোতির্ময়।

নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির প্রভাবে যাদের চোখ ঝলসে গেছে তারা কখনো সবিশেষ চিন্ময় তত্ত্বকে জানতে পারে না; তাই *ঈশোপনিষদে (১৫)* প্রার্থনা করা হয়েছে যে ভগবান যেন তাঁর চোখ-ঝলসানো জ্যোতি সংবরণ করেন যাতে ভক্তেরা তাঁর প্রকৃত রূপ দর্শন করতে পারেন। সেই শ্লোকটি হচ্ছে—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥

"হে ভগবান, আপনি জড় এবং চেতন উভয় জগতের সব কিছুরই পালন কর্তা, এবং আপনার কৃপার প্রভাবেই সবকিছু সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আপনার প্রতি প্রেমময়ী সেবা বা ভক্তিযোগ হচ্ছে ধর্মের মূল তত্ত্ব বা সত্য ধর্ম, এবং আমি সেই সেবায় যুক্ত। তাই দয়া করে আপনার প্রকৃত রূপ প্রদর্শন করে আমাকে রক্ষা করুন। তাই, দয়া করে আপনি ব্রহ্মজ্যোতির অবগুণ্ঠন উন্মোচন করুন যার ফলে আমি আপনার সচ্চিদানন্দময় রূপ দর্শন করতে পারি।"

শ্লোক ১৫

যৎকীর্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং
যদ্বন্দনং যচ্ছ্রবণং যদর্হণম্।
লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥ ১৫॥

যৎ—যাঁর; **কীর্তনম্**—মহিমা গান; **যৎ**—যাঁর; **স্মরণম্**—স্মরণ; **যৎ**—যাঁর; **ঈক্ষণম্**—দর্শন; **যৎ**—যাঁর; **বন্দনম্**—প্রার্থনা; **যৎ**—যাঁর; **শ্রবণম্**—শ্রবণ; **যৎ**—যাঁর; **অর্হণম্**—পূজা; **লোকস্য**—সমস্ত মানুষদের; **সদ্যঃ**—শীঘ্র; **বিধুনোতি**—বিশেষভাবে পরিষ্কার করে; **কল্মষম্**—পাপের প্রভাব; **তস্মৈ**—তাঁকে; **সুভদ্র**—সর্বমঙ্গলময়; **শ্রবসে**—যশগাথা; **নমঃ**—আমার শ্রদ্ধ প্রণাম; **নমঃ**—পুনঃ পুনঃ প্রণতি।

অনুবাদ

আমি সেই সর্বমঙ্গলময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি, যাঁর যশগাথা কীর্তন, স্মরণ, দর্শন, বন্দন, শ্রবণ এবং পূজনের ফলে সমস্ত পাপরাশি অচিরেই ধৌত হয়।

তাৎপর্য

সমস্ত পাপের ফল থেকে মুক্ত হওয়ার সাবলীল পন্থা এখানে সর্বশ্রেষ্ঠ মহাজন শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। ভগবানের মহিমা কীর্তন নানাভাবে অনুষ্ঠান করা সম্ভব, যেমন স্মরণ, মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন, ভগবানের সামনে তাঁর বন্দনা এবং শ্রীমদ্ভাগবত অথবা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবানের যে সমস্ত মহিমা কীর্তিত হয়েছে তা শ্রবণ। মধুর সঙ্গীতসহ ভগবানের মহিমা গান করার মাধ্যমে অথবা শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আদি শাস্ত্র পাঠের মাধ্যমে, উভয় প্রকারে কীর্তন অনুষ্ঠান করা যায়।

ভগবানের দৈহিক অনুপস্থিতিতে ভক্তদের নিরাশ হওয়া উচিত নয়, যদিও তাঁরা মনে করতে পারেন যে তাঁরা তাঁর সঙ্গ লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। কীর্তন, শ্রবণ,

স্মরণ ইত্যাদি ভক্ত্যাঙ্গের (কোন একটি অঙ্গের অথবা সবকটি অঙ্গের) অনুশীলন করার ফলে অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবা সম্পাদনের মাধ্যমে ভগবানের সান্নিধ্যের ঈপ্সিত ফল লাভ করা যায়। এমনকি ভগবানের দিব্য নাম কৃষ্ণ অথবা রাম উচ্চারণের ফলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পরিবেশ চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। আমাদের নিশ্চিতভাবে জেনে রাখা উচিত যে যেখানে এইপ্রকার শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন হয় ভগবান সেখানে উপস্থিত থাকেন, এবং তার ফলে নিরপরাধে ভগবানের নাম কীর্তনকারী ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেন। তেমনি, সুদক্ষ পরিচালনায় যথাযথভাবে স্মরণ এবং বন্দন হলেও ঈপ্সিত ফল লাভ করা যায়। ভগবদ্ভক্তির মনগড়া পন্থা প্রস্তুত করা উচিত নয়। কেউ মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করতে পারে, অথবা অন্য কেউ মসজিদে বা গীর্জায় তাঁর নির্বিশেষ রূপের উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে প্রার্থনা নিবেদন করতে পারে। মন্দিরে আরাধনা অথবা গীর্জায় প্রার্থনা করার মাধ্যমে মানুষ নিশ্চিতভাবে পাপের ফল থেকে মুক্ত হতে পারে, যদি সে পুনরায় পাপ না করার ব্যাপারে সচেতন থাকে। ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের বলে স্বেচ্ছাকৃতভাবে পাপ করার মনোভাবকে বলা হয় *নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপ বুদ্ধিঃ,* অর্থাৎ নামবলে পাপাচরণ করা. এবং ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনে এইটিই হচ্ছে সবচাইতে গর্হিত অপরাধ। তাই এইপ্রকার পাপের সম্ভাবনা থেকে সাবধান থাকার জন্য শ্রবণ অত্যন্ত আবশ্যক। এই শ্রবণ-বিধির বিষয়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করার জন্য শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সর্বমঙ্গলময় সৌভাগ্যের আহ্বান করেছেন।

শ্লোক ১৬

বিচক্ষণা যচ্চরণোপসাদনাৎ
সঙ্গং ব্যুদস্যোভয়তোঽন্তরাত্মনঃ।
বিন্দন্তি হি ব্রহ্মগতিং গতক্লমা-
স্তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ ১৬ ॥

বিচক্ষণাঃ—অত্যন্ত বুদ্ধিমান; **যৎ**—যাঁর; **চরণ-উপসাদনাৎ**—তাঁর চরণকমলে আত্ম-সমর্পণ করার ফলে; **সঙ্গম্**—আসক্তি; **ব্যুদস্য**—সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে; **উভয়তঃ**—বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ অস্তিত্বে; **অন্তঃ-আত্মনঃ**—হৃদয়ের এবং আত্মার; **বিন্দন্তি**—প্রগতি; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **ব্রহ্মগতিম্**—পারমার্থিক জগতের প্রতি; **গতক্লমাঃ**—নির্বিঘ্নে; **তস্মৈ**—তাঁকে; **সুভদ্র**—সর্বমঙ্গলময়; **শ্রবসে**—যাঁর বিষয়ে শ্রবণ করা হয়েছে; **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি; **নমঃ**—পুনঃ পুনঃ প্রণতি।

অনুবাদ

আমি সর্বমঙ্গল ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার আমার প্রণতি নিবেদন করি। তাঁর চরণকমলের শরণ গ্রহণ করার ফলে পরম বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হন এবং অনায়াসে চিন্ময় জগতের প্রতি অগ্রসর হন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন তথা তাঁর সমস্ত অনন্য ভক্তদের বারংবার উপদেশ প্রদান করেছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮/৬৪-৬৬) তাঁর অন্তিম উপদেশ হচ্ছে

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়ম ইতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজি মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"হে অর্জুন, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এবং তাই তোমার কল্যাণের জন্য আমি আমার গুহ্যতম উপদেশ তোমার কাছে প্রকাশ করব। তা হচ্ছে, আমার শুদ্ধ ভক্ত হও এবং সর্বতোভাবে আমার কাছে নিজেকে সমর্পণ কর। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে পূর্ণরূপে তোমার পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ হবে, যার ফলে তুমি আমার অপ্রাকৃত প্রেমময়ী ভক্তি লাভ করতে পারবে। সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও তা হলে আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সে সম্বন্ধে কোন দুশ্চিন্তা করো না।"

বুদ্ধিমান মানুষেরা ভগবানের এই অন্তিম উপদেশটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেন। আত্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞান হচ্ছে পারমার্থিক উপলব্ধির প্রথম পদক্ষেপ, যাকে বলা হয় গুহ্য জ্ঞান। তার পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে ভগবদুপলব্ধি, যাকে বলা হয় গুহ্যতর জ্ঞান। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চরম পরিণতি এই ভগবদুপলব্ধিতে, এবং এই ভগদুপলব্ধির স্তরপ্রাপ্ত হলে স্বাভাবিকভাবে স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় ভক্ত যুক্ত হন। সর্বদাই এই ভগবদ্ভক্তির ভিত্তি হচ্ছে ভগবৎ-প্রেম, এবং তা কর্মযোগ, জ্ঞান যোগ বা ধ্যান যোগের গতানুগতিক বিধি থেকে ভিন্ন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বিভিন্ন স্তরের মানুষদের ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ দেওয়া হয়েছে, এবং সেখানে বর্ণাশ্রম ধর্ম, সন্ন্যাস ধর্ম, ইন্দ্রিয়-দমন, ধ্যান, যোগ-সিদ্ধি আদি বিভিন্ন পন্থার বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু যিনি সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁর প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমবশত সেবা সম্পাদন করেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে বেদে বর্ণিত সমস্ত জ্ঞানের সারমর্ম যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন। যিনি অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে এই পন্থা অবলম্বন করেন তিনি তৎক্ষণাৎ জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করেন। মানব জীবনের এই সিদ্ধিকে বলা হয় ব্রহ্মগতি। বৈদিক নির্দেশের ভিত্তিতে শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, ব্রহ্মগতির অর্থ হল, ভগবানের মতো চিন্ময় রূপ প্রাপ্ত হওয়া, এবং সেইরূপে মুক্ত জীব চিদাকাশের কোন চিন্ময় ধামে নিত্য জীবন লাভ করেন। সিদ্ধি লাভের কোন কঠোর পন্থা অনুশীলন না করেই ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত অনায়াসে জীবনের এই পরম সিদ্ধি লাভ

করেন। এই প্রকার ভক্তিময় জীবন পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণিত *কীর্তনম্, স্মরণম্, ঈক্ষণম্* ইত্যাদিতে পূর্ণ। তাই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি লাভের জন্য ভগবদ্ভক্তির এই সরল পন্থা অবলম্বন করা, তা তিনি পৃথিবীর যে কোন স্থানে যে কোন অবস্থাতেই থাকুন না কেন। বৃন্দাবনে ক্রীড়ারত শিশুরূপে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ব্রহ্মার যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি তাঁর বর্ণনা করে বলেছিলেন—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্যতে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ (ভাঃ ১০/১৪/৪)

ভক্তিযোগ হচ্ছে সর্বোচ্চ স্তরের সিদ্ধি যা বুদ্ধিমান মানুষেরা বহু পারমার্থিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করার বিনিময়ে লাভ করে থাকেন। এখানে যে দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত উপযুক্ত। একমুঠো চাল স্তূপীকৃত তুষের থেকে অধিক মূল্যবান। তেমনই মানুষের কর্তব্য কর্মকাণ্ড,জ্ঞানকাণ্ড বা যোগাসন ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে সদ্‌গুরুর নির্দেশে কীর্তন, স্মরণ আদি সরল পন্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে অনায়াসে চরম সিদ্ধি লাভ করা।

শ্লোক ১৭

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো
মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ ১৭ ॥

তপস্বিনঃ—মহা বিদ্বান্ ঋষিগণ; **দানপরা**—মহান দাতাগণ; **যশস্বিনঃ**—যশস্বী ব্যক্তিগণ; **মনস্বিনঃ**—মহান দার্শনিক বা যোগীগণ; **মন্ত্রবিদঃ**—বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে পারদর্শী ব্যক্তিগণ; **সুমঙ্গলাঃ**—বৈদিক সিদ্ধান্তে নিষ্ঠাবান অনুগামী; **ক্ষেমম্**—সকাম ফল; **ন**—কখনই না; **বিন্দন্তি**—প্রাপ্ত হন; **বিনা**—ব্যতীত; **যদর্পণম্**—সমর্পণ; **তস্মৈ**—তাঁকে; **সুভদ্র**—শুভ; **শ্রবসে**—তাঁর বিষয়ে শ্রবণ করে; **নমঃ**—আমার প্রণতি; **নমঃ**—পুনঃ পুনঃ প্রণতি।

অনুবাদ

আমি সর্ব মঙ্গলময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, কেননা তপস্যা পরায়ণ মহান্ ঋষিগণ, দানশীল কর্মীগণ, প্রতিষ্ঠাবান যশস্বীগণ, মনস্বী বা যোগীগণ, বেদজ্ঞ মন্ত্র উচ্চারণকারীগণ অথবা সদাচারী পুরুষগণ কেউই সেই সমস্ত মহান গুণের দ্বারা ভগবানের সেবা না করে মঙ্গল লাভ করতে সমর্থ হন না।

তাৎপর্য

উচ্চশিক্ষা, দানশীলতা, মানব সমাজে রাজনৈতিক, সামাজিক অথবা ধর্মীয় নেতৃত্ব, দার্শনিক জ্ঞান, যোগাভ্যাস, বৈদিক অনুষ্ঠানে নিপুণতা আদি মানুষের সমস্ত উত্তম গুণাবলী তখনই তার সিদ্ধিপ্রাপ্তির সহায়ক হয় যখন তা ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়। তা না হলে এই সমস্ত গুণ মানুষের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সব কিছু, হয় নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য অথবা অপরের সেবায় ব্যবহার করা যায়। স্বার্থও দুই প্রকার—ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং বিস্তৃত স্বার্থ। কিন্তু এই দুই প্রকার স্বার্থের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেউ যদি তার ব্যক্তিগত স্বার্থে চুরি করে অথবা পারিবারিক স্বার্থে চুরি করে, তার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই; অর্থাৎ উভয়ক্ষেত্রেই তা অপরাধজনক। কোন চোর যদি বিচারকের কাছে আবেদন করে বলে যে সে নির্দোষ কেন না সে ব্যক্তিগত স্বার্থে চুরি করেনি, পক্ষান্তরে তা করেছে সমাজের বা রাষ্ট্রের স্বার্থে তাহলে কি কখনো কোন দেশের আইন তাকে ক্ষমা করবে? সাধারণ মানুষ জানে না যে, জীবের স্বার্থ তখনই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় যখন তা ভগবানের স্বার্থ থেকে অভিন্ন হয়। যেমন, দেহ এবং আত্মা একসাথে পালন ও পোষণ করার স্বার্থ কি? মানুষ অর্থ উপার্জন করে দেহের পালন-পোষণের জন্য (ব্যক্তিগত বা সামাজিক), কিন্তু যদি ভগবচ্চেতনা না থাকে, যদি দেহের পালন-পোষণ ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কের উপলব্ধির জন্য না হয়, তা হলে দেহ এবং আত্মার পালন-পোষণের সমস্ত প্রয়াস পশুর জীবন ধারণের মতো হয়। মানুষের জীবন ধারণের উদ্দেশ্য পশুদের থেকে ভিন্ন। তাই, উচ্চ শিক্ষা, অর্থনৈতিক প্রগতি, দার্শনিক গবেষণা, বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন অথবা পুণ্য কর্ম (যথা দান, হাসপাতাল খোলা, অন্নদান) ইত্যাদি ভগবানের সম্পর্কে সম্পাদন করা উচিত। ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই কেবল এই সমস্ত কার্যকলাপ এবং প্রচেষ্টা করা উচিত। কখনোই অন্য কোন উদ্দেশ্যে, তা ব্যক্তিগতই হোক অথবা সমষ্টিগতই হোক, করা উচিত নয় (*সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্*)। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/২৭) এই সিদ্ধান্তটি প্রতিপন্ন হয়েছে, যখন বলা হয়েছে যে, আমরা যা কিছু দান করি এবং যে তপস্যার অনুষ্ঠান করি তা যেন অবশ্যই কেবল ভগবানের উদ্দেশ্যে সাধিত হয়। ভগবদ্বিহীন মানব সমাজের নেতারা যতই সুদক্ষ হোক না কেন, তাদের শিক্ষার উন্নতি সাধনের এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের সমস্ত প্রচেষ্টা কখনোই ফলপ্রসূ হবে না যদি তা ভগবচ্চেতনা সমন্বিত না হয়। আর ভগবদ্ভাবনায় ভাবিত হতে হলে মানুষকে সর্বমঙ্গলময় ভগবানের বিষয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত আদি গ্রন্থ থেকে শ্রবণ করতে হবে।

শ্লোক ১৮

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা
আভীরশুম্ভা যবনাঃ খসাদয়ঃ।

যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ ১৮ ॥

কিরাত—প্রাচীন ভারতে একটি অঞ্চল ; **হূণ**—জার্মানি এবং রাশিয়ার একটি অংশ ; **আন্ধ্র**—দক্ষিণ ভারতের একটি অঞ্চল ; **পুলিন্দ**—গ্রীক ; **পুল্কশা**—আর একটি অঞ্চল ; **আভীর**—প্রাচীন সিন্ধুপ্রদেশের একটি অংশ ; **শুম্ভাঃ**—আর একটি অঞ্চল ; **যবনাঃ**—তুর্কী ; **খসাদয়ঃ**—মঙ্গোলিয়ার একটি অঞ্চল ; **যে**—তারাও ; **অন্যে**—অন্যরা ; **চ**—ও ; **পাপা**—পাপ কর্মে আসক্ত ; **যৎ**—যাঁর ; **অপাশ্রয়-আশ্রয়া**—ভক্তের শরণ গ্রহণ করে ; **শুধ্যন্তি**—তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয় ; **তস্মৈ**—তাঁকে ; **প্রভবিষ্ণবে**—শক্তিমান শ্রীবিষ্ণুকে ; **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি।

অনুবাদ

কিরাত, হূণ, আন্ধ্র, পুলিন্দ, পুল্কশ, আভীর, শুম্ভ, যবন, খস তথা অন্যান্য সমস্ত জাতির পাপাসক্ত মানুষেরা যাঁর ভক্তদের শরণ গ্রহণ করার ফলে শুদ্ধ হতে পারে, আমি সেই পরম শক্তিশালী পরমেশ্বর ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

কিরাত ঃ প্রাচীন ভারতের একটি অঞ্চল, মহাভারতের ভীষ্মপর্বে যার উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণত কিরাতেরা ভারতের আদিবাসীরূপে পরিচিত এবং আধুনিক বিহার ও ছোটনাগপুরের সাঁওতাল পরগনা হয়ত প্রাচীন কিরাত প্রদেশ।

হূণ ঃ জার্মানি এবং রাশিয়ার কিছু অংশ হচ্ছে হূণ প্রদেশ। সেই অনুসারে কখনো কখনো পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদেরও হূণ বলা হয়।

আন্ধ্র ঃ মহাভারতের ভীষ্মপর্বে উল্লিখিত দক্ষিণ ভারতের একটি অঞ্চল। এই অঞ্চলটি এখনও সেই নামেই পরিচিত।

পুলিন্দ ঃ মহাভারতে (*আদিপর্ব ১৭৪/৩৮*) পুলিন্দ নামক অঞ্চলের অধিবাসীদের উল্লেখ করা হয়েছে। সহদেব এবং ভীষ্মসেন এই দেশটি জয় করেন। গ্রীকদের পুলিন্দ বলা হয়। মহাভারতের বনপর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই অবৈদিক জাতি সারা পৃথিবীর উপর একসময় আধিপত্য করবে। এই পুলিন্দ অঞ্চল ভারতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সেখানকার অধিবাসীদের ক্ষত্রিয় বলে গণনা করা হত। কিন্তু পরবর্তীকালে, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি পরিত্যাগ করার ফলে তাদের ম্লেচ্ছ বলে বিবেচনা করা হয় (ঠিক যেমন মুসলমানদের মধ্যে যারা মুসলমান ধর্ম মানে না তাদের কাফের বলা হয় এবং খ্রীষ্টানদের মধ্যে যারা খ্রীষ্টান ধর্ম মানে না তাদের হেথেন্স বলা হয়)।

আভীর ঃ মহাভারতের সভা পর্বে এবং ভীষ্ম পর্বে এই নামটির উল্লেখ দেখা যায়। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই অঞ্চলটি সিন্ধু প্রদেশে সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। পূর্বে সিন্ধু প্রদেশ বিস্তৃত ছিল আরব সাগরের অপর প্রান্ত পর্যন্ত, এবং

সেখানকার অধিবাসীরা আভীর নামে পরিচিত ছিল। তারা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অধীন ছিল, এবং মার্কণ্ডেয়-পুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে যে এই অঞ্চলের ম্লেচ্ছরা ভারতবর্ষের উপর আধিপত্য করবে। পরবর্তীকালে পুরাণের সেই বাণী সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল, ঠিক যেমন পুলিন্দদের সম্বন্ধে বলা হয়েছিল। পুলিন্দ জাতির আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ জয় করেছিল, এবং আভীরদের পক্ষে মহম্মদ ঘোরী ভারতবর্ষ জয় করেছিল। পূর্বে আভীরেরাও ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির ক্ষত্রিয় জাতি ছিল, কিন্তু তারা সেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে। যে সমস্ত ক্ষত্রিয়রা পরশুরামের ভয়ে ভীত হয়ে ককেসাস প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলে আত্মগোপন করেছিল, পরবর্তীকালে তারা আভীর নামে পরিচিত হয়, এবং যে অঞ্চলে তারা বসবাস করত সেই অঞ্চলটি আভীর দেশ নামে পরিচিত হয়।

শুম্ভ বা কঙ্কঃ মহাভারতে উল্লিখিত প্রাচীন ভারতের কঙ্ক নামক প্রদেশের অধিবাসী।

যবনঃ মহারাজ যযাতির পুত্র তুর্বসুর বংশধরেরা যবন নামে পরিচিত। তুর্বসুকে বর্তমান তুরস্কের আধিপত্য প্রদান করা হয়েছিল। তাই তুর্বসুর বংশধর তুরস্কের অধিবাসীরা হচ্ছে যবন। যবনেরাও তাই ছিল ক্ষত্রিয়, এবং পরবর্তীকালে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি পরিত্যাগ করার ফলে তারা ম্লেচ্ছ-যবনে পরিণত হয়। মহাভারতে (আদি পর্ব ৮৫/৩৪) যবনদের বর্ণনা করা হয়েছে। পঞ্চপাণ্ডবদের অন্যতম সহদেব সেই দেশটি জয় করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় কর্ণের চাপে পশ্চিমের যবনেরা দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। বেদে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, যবনেরাও ভারতবর্ষ জয় করে তার উপর আধিপত্য করবে, এবং পরবর্তীকালে তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

খসঃ মহাভারতের দ্রোণ পর্বে খস দেশের অধিবাসীদের উল্লেখ করা হয়েছে। যে জাতির মানুষদের গোঁফের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় তাদের বলা হয় খস। মঙ্গোলীয়, চীন, এবং অন্যান্য যে সমস্ত স্থানের মানুষদের আকৃতি সেইরকম, তাদের বলা হয় খস।

উপরোক্ত ঐতিহাসিক নামগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নাম। এমনকি যারা নিরন্তর পাপকার্যে লিপ্ত তারাও ভগবদ্ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে শুদ্ধ হয়ে যথার্থ মনুষ্য স্তর প্রাপ্ত হতে পারে। যিশুখ্রিস্ট এবং মহম্মদ, ভগবানের দুজন শক্তিশালী ভক্ত ভগবানের প্রতিনিধিরূপে পৃথ্বীপৃষ্ঠে এক বিরাট কার্য সম্পাদন করেছেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর বর্ণনা থেকে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে আধুনিক পৃথিবীর ভগবদ্বিহীন শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে, ভগবানের ভক্তদের উপর যদি পৃথিবীর নেতৃত্ব করার দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়, যে জন্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ নামক সারা পৃথিবীব্যাপী একটি সংস্থা গঠিত হয়েছে, তাহলে সর্বশক্তিমান ভগবানের কৃপায় সারা পৃথিবীর মানুষদের হৃদয়ে এক অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন হতে পারে, কেননা জনসাধারণের কলুষিত হৃদয় পরিবর্তন করার ক্ষমতা কেবল ভগবানের ভক্তদেরই রয়েছে। পৃথিবীর রাজনৈতিক নেতারা তাদের নিজেদের আসনে আসীন থাকতে পারে, কেননা ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা রাজনৈতিক নেতৃত্ব অথবা কূটনৈতিক কার্যকলাপের

প্রতি মোটেই আসক্ত নন। ভগবদ্ভক্তেরা কেবল এটিই চান যে রাজনৈতিক অপপ্রচারের ফলে জনসাধারণ যেন বিপথগামী না হয় এবং ধ্বংসোন্মুখ সভ্যতার অনুসরণ করে জনসাধারণের দুর্লভ মানব জীবন যেন ব্যর্থ না হয়। তাই রাজনৈতিক নেতারা যদি ভগবদ্ভক্তদের সদুপদেশের দ্বারা পরিচালিত হন, তা হলে অবশ্যই পৃথিবীর বুকে এক মহান্ পরিবর্তন সাধিত হবে যা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দেখিয়ে গিয়েছিলেন। শুকদেব গোস্বামী তাঁর প্রার্থনা শুরু করেছেন *যৎ-কীর্তনম্* শব্দটির মাধ্যমে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের সরল পন্থাই নির্দেশ করে গেছেন, তার ফলে মানব হৃদয়ে এক অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন হতে পারে এবং তখন রাজনীতিবিদেরা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে এক মনোমালিন্য সৃষ্টি করেছে তা অচিরেই দূর হতে পারে। বিবাদের অগ্নি নির্বাপিত হলে আপনা থেকেই অন্যান্য সুফলগুলি দেখা দেবে। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া, যা আমরা পূর্বে কয়েকবার আলোচনা করেছি।

ভক্তি-সম্প্রদায়ের মতানুসারে, সাধারণত যাকে বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলা হয়ে থাকে, ভগবদুপলব্ধির মার্গে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। বৈষ্ণব এমনই শক্তিশালী যে তিনি পূর্বোল্লিখিত কিরাত আদি নীচ জাতিদেরও বৈষ্ণবে পরিণত করতে পারেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/৩২) ভগবান বলেছেন যে ভগবদ্ভক্ত হওয়ার ব্যাপারে কারোরই কোন বাধা নেই (এমন কি নিম্নকুলোদ্ভূত বৈশ্য, শূদ্র এবং স্ত্রীলোকেরা পর্যন্ত ভগবদ্ভক্ত হতে পারে)। আর ভগবানের ভক্ত হওয়ার ফলে সকলেই তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। ভগবদ্ভক্ত হওয়ার ব্যাপারে কেবল একটিই যোগ্যতার প্রয়োজন এবং তা হচ্ছে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের শরণাগত হতে হবে। পৃথিবীর যে কোন স্থানের যে কোন ব্যক্তি, যিনি কৃষ্ণ-তত্ত্ব-বিজ্ঞানে পারঙ্গত, তিনি শুদ্ধ ভক্ত হতে পারেন এবং জনসাধারণের গুরু হয়ে তাদের হৃদয় শুদ্ধ করে তাদের উদ্ধার করতে পারেন। কেউ যদি মস্ত বড় পাপীও হয়, সেও শুদ্ধ বৈষ্ণবের যথাযথ সঙ্গ প্রভাবে তৎক্ষণাৎ তার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হতে পারে। তাই বৈষ্ণব জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে পৃথিবীর যে কোন স্থানের মানুষদের শিষ্যত্বে বরণ করতে পারেন, এবং তাদের বিধি-বিধানের দ্বারা শুদ্ধ বৈষ্ণবে পরিণত করতে পারেন, যা হচ্ছে ব্রহ্মণ্য-সংস্কৃতিরও ঊর্ধ্বে। এমনকি এই পন্থার তথাকথিত অনুগামীদের কাছেও বর্ণাশ্রম-ধর্মের প্রচলন থাকে না। বর্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিপ্লবের যুগে বর্ণাশ্রম ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব নয়। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রীতিনীতির অপেক্ষা না করে সকলেই পারমার্থিক বৈষ্ণব-পন্থা অবলম্বন করতে পারেন, এবং এই অপ্রাকৃত পন্থা অনুসরণে কোনরকম বাধ্য-বাধকতা নেই। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে, শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাণী পৃথিবীর সর্বত্র প্রচার করার মাধ্যমে, সেই পন্থা অনুসরণে আগ্রহী ব্যক্তিদের উদ্ধার করা যেতে পারে। ভক্তদের দ্বারা প্রচারিত এই সাংস্কৃতিক আন্দোলন

বিচক্ষণ এবং জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রীতি নীতির অপেক্ষা না করেই গ্রহণ করবেন। বৈষ্ণব কখনো অপর বৈষ্ণবের জাতি-বুদ্ধি করেন না, ঠিক যেমন মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে মূর্তি বলে মনে করেন না। এই বিষয়ে সমস্ত সন্দেহ দূর করার জন্য শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবানের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন। (*প্রভবিষ্ণবে নমঃ*)। সর্বশক্তিমান ভগবান যেমন তাঁর ভক্তের ভক্তিময় অর্চনার সামান্য সেবাই গ্রহণ করেন এবং মন্দিরে তাঁর আরাধ্য বিগ্রহ চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমনই শুদ্ধ ভক্তের দেহ যখন উপযুক্ত বৈষ্ণবের শিক্ষকতায় ভগবানের সেবায় উৎসর্গীকৃত হয়, তখন তাও চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব-বিধির নির্দেশ হচ্ছে—*অর্চে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধিঃ শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি শব্দসামান্যবুদ্ধিঃ* ইত্যাদি। "মন্দিরে পূজিত ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে মূর্তি বলে মনে করা উচিত নয়, সদ্ গুরুকে সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়, শুদ্ধ বৈষ্ণবকে কোন বিশেষ জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা উচিত নয় এবং ভগবানের দিব্য নামকে সাধারণ শব্দ বলে মনে করা উচিত নয়।" *(পদ্ম-পুরাণ)*।

অর্থাৎ, সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, যেহেতু ভগবান সর্বশক্তিমান, তাই তিনি যে কোন অবস্থায় পৃথিবীর যে কোন স্থানের যে কোন ব্যক্তিকে স্বয়ং অথবা তাঁর অভিন্ন প্রকাশস্বরূপ সদ্গুরুর মাধ্যমে অঙ্গীকার করতে পারেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বর্ণাশ্রম বহির্ভূত সম্প্রদায় থেকে বহু ভক্ত অঙ্গীকার করেছিলেন এবং তিনি স্বয়ং আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য, ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি কোন বর্ণ এবং আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত নন, পক্ষান্তরে তিনি হচ্ছেন ব্রজগোপীদের ভর্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাসানুদাস। এইটিই হচ্ছে আত্ম উপলব্ধির পন্থা।

শ্লোক ১৯

স এষ আত্মাত্মবতামধীশ্বর-
ত্রয়ীময়ো ধর্মময়স্তপোময়ঃ।
গতব্যলীকৈরজশঙ্করাদিভি-
র্বিতর্ক্যলিঙ্গো ভগবান্ প্রসীদতাম্ ॥ ১৯ ॥

সঃ—তিনি; **এষঃ**—এই; **আত্মা**—পরমাত্মা; **আত্মবতাম্**—আত্মতত্ত্ববেত্তাদের; **অধীশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **ত্রয়ীময়ঃ**—মূর্তিমান বেদ; **ধর্মময়ঃ**—মূর্তিমান ধর্মশাস্ত্র; **তপঃ-ময়ঃ**—মূর্তিমান তপস্যা; **গতব্যলীকৈঃ**—যিনি সমস্ত কপটতার ঊর্ধ্বে তাঁর দ্বারা; **অজ**—ব্রহ্মা; **শঙ্করাদিভিঃ**—শিব এবং অন্যদের দ্বারা; **বিতর্ক্যলিঙ্গঃ**—যাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম সহকারে দর্শন করা হয়; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **প্রসীদতাম্**—তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।

অনুবাদ

তিনি আত্মতত্ত্ববেত্তা পুরুষদের পরমাত্মা এবং পরমেশ্বর। তিনি বেদ, ধর্মশাস্ত্র এবং তপস্যার মূর্তিমান প্রকাশ। তিনি ব্রহ্মা, শিব এবং কপটতা রহিত সমস্ত ব্যক্তিদের দ্বারা পূজিত। এই প্রকার শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের আস্পদ পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান যদিও আত্ম-উপলব্ধির বিভিন্ন পন্থার সমস্ত অনুগামীদেরই প্রভু, তথাপি যারা সমস্ত কপটতা এবং ছলনা থেকে মুক্ত তাঁরাই কেবল তাঁকে জানতে পারেন। সকলেই পরাশান্তি এবং নিত্য জীবনের অন্বেষণ করছে, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সকলেই হয় বৈদিক শাস্ত্র নয়তো অন্যান্য ধর্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন অথবা কঠোর তপস্যা করছেন। তাঁরা হচ্ছেন জ্ঞানী, যোগী, অনন্য ভক্ত ইত্যাদি পরমার্থবাদী। কিন্তু অনন্য ভক্তরাই কেবল ভগবানকে পূর্ণরূপে জানতে পারেন, কেননা তাঁরা সমস্ত ছলনা এবং কপটতা থেকে মুক্ত। যাঁরা আত্ম উপলব্ধির পথ অবলম্বন করেছেন, তাঁদের কর্মী, জ্ঞানী, যোগী এবং ভগবদ্ভক্ত এই চারটি স্তরে বিভক্ত করা হয়। যারা বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত তাদের বলা হয় কর্মী বা ভুক্তিকামী, অর্থাৎ যারা জড় সুখভোগে আকাঙ্ক্ষী। মননের দ্বারা যারা ভগবানকে জানতে চায়, তাদের বলা হয় জ্ঞানী বা মুক্তিকামী, অথবা যারা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষী। যারা আট প্রকার জড় সিদ্ধি লাভের জন্য বিভিন্ন রকম তপস্যা করে, তাদের বলা হয় যোগী, এবং চরমে তারা সমাধিস্থ অবস্থায় পরমাত্মাকে দর্শন করে ; তারা সিদ্ধিকামী বা অণিমা, গরিমা, প্রাপ্তি, ঈশিত্ব, বশিত্ব ইত্যাদি সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষী। শক্তিশালী যোগীদের সেই সমস্ত ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু ভগবদ্ভক্তরা তাঁদের আত্মতৃপ্তির জন্য সেই সমস্ত কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাঁরা কেবল চান পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করতে, কেননা ভগবান হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং জীবরূপে তাঁরা তাঁর বিভিন্ন অংশ এবং নিত্য দাস। তাঁর স্বরূপে এই পূর্ণ উপলব্ধি ভগবদ্ভক্তকে নিষ্কাম হতে সাহায্য করে, অর্থাৎ তিনি তাঁর নিজের জন্য কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না।জীব তার স্বরূপে বাসনারহিত হতে পারে না। তবে ভুক্তিকামী, মুক্তিকামী এবং সিদ্ধিকামীরা তাদের ব্যক্তিগত সুখের বাসনা করে, কিন্তু নিষ্কাম কৃষ্ণভক্তেরা কেবল পরমেশ্বর ভগবানের তৃপ্তি সাধনের বাসনা করেন। তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের আদেশের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল এবং তাঁরা সর্বদাই ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁদের কর্তব্য সম্পাদনে প্রস্তুত থাকেন।

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রাক্কালে অর্জুন তাঁর নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনায় যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে বাসনা শূন্য করার জন্য ভগবান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শুনিয়েছিলেন, যাতে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, হঠযোগ এবং ভক্তিযোগের

পন্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অর্জুন যেহেতু ছিলেন নিষ্কপট, তাই তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যুদ্ধ করতে সম্মত হয়েছিলেন (*করিষ্যে বচনং তব*), এবং তার ফলে তিনি বাসনাশূন্য হয়েছিলেন।

এখানে ব্রহ্মা এবং শিবের দৃষ্টান্ত বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কেননা ব্রহ্মা, শিব, লক্ষ্মীদেবী এবং চার কুমার সনক, সনাতন আদি হচ্ছেন চারটি নিষ্কাম বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। তাঁরা সমস্ত কপটতা থেকে মুক্ত। শ্রীল জীব গোস্বামী *গতব্যলীকৈঃ* শব্দটির বিশ্লেষণ করেছেন *প্রোজ্ঝিত কৈতবৈঃ* রূপে, অর্থাৎ যারা সব রকম কপটতা থেকে মুক্ত (ভগবানের অনন্য ভক্ত)। *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে* (মধ্য ১৯/১৪৯) বলা হয়েছে—

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী', সকলি 'অশান্ত' ॥

যারা তাদের পুণ্য কর্মের ফল আকাঙ্ক্ষা করে, যারা ব্রহ্মে লীন হয়ে গিয়ে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করে, এবং যারা যোগসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করে, তারা অশান্ত, কেননা তারা সকলেই তাদের নিজেদের জন্য কিছু চায়। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সম্পূর্ণরূপে শান্ত, কেননা তিনি তাঁর নিজের জন্য কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং সর্বদাই ভগবানের বাসনা অনুসারে সেবা করতে প্রস্তুত থাকেন। তাই সিদ্ধান্তস্বরূপ বলা যায় যে ভগবান সকলেরই, কেননা তাঁর অনুমোদন ব্যতীত কেউই তাদের ঈপ্সিত ফল লাভ করতে পারে না, কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৮/৯) ভগবানই ঘোষণা করেছেন যে তিনিই সকলকে তাদের কর্মের ফল প্রদান করেন, কেননা ভগবান হচ্ছেন বৈদান্তিক, কর্মকাণ্ডী, ধর্মনেতা, তপস্বী আদি পারমার্থিক মার্গে অগ্রসর হতে আকাঙ্ক্ষী সকলেরই অধীশ্বর (পরম নিয়ন্তা)। কিন্তু চরমে নিষ্কপট ভক্তরাই কেবল তাঁকে উপলব্ধি করতে পারেন। তাই শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ভগবদ্ভক্তির বিষয়ে বিশেষ জোর দিয়েছেন।

শ্লোক ২০

শ্রিয়ঃ পতির্যজ্ঞপতিঃ প্রজাপতি-
র্ধিয়াং পতির্লোকপতির্ধরাপতিঃ।
পতির্গতিশ্চান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতাং
প্রসীদতাং মে ভগবান্ সতাং পতিঃ ॥ ২০ ॥

শ্রিয়ঃ—সমস্ত ঐশ্বর্য; **পতিঃ**—অধীশ্বর; **যজ্ঞ**—যজ্ঞের; **পতিঃ**—নির্দেশক; **প্রজাপতিঃ**—সমস্ত জীবেদের নায়ক; **ধিয়াম্**—বুদ্ধির; **পতিঃ**—প্রভু; **লোকপতিঃ**—সমস্তলোকের অধীশ্বর; **ধরা**—পৃথিবী; **পতিঃ**—পরম; **পতিঃ**—প্রধান; **গতিঃ**—গন্তব্যস্থল; **চ**—ও; **অন্ধক**—যদুবংশের একজন রাজা; **বৃষ্ণি**—যদু বংশের প্রথম

রাজা ; **সাত্বতাম্**—যদুগণ ; **প্রসীদতাম্**—প্রসন্ন হোন ; **মে**—আমার প্রতি ; **ভগবান্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ; **সতাম্**—সমস্ত ভক্তদের ; **পতিঃ**—প্রভু।

অনুবাদ

সমস্ত ভক্তদের আরাধ্য ভগবান, অন্ধক, বৃষ্ণি প্রমুখ যদুবংশীয় রাজাদের পালক এবং গৌরব ও সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর পতি, সমস্ত যজ্ঞের নির্দেশক এবং সেই সূত্রে সমস্ত জীবের নায়ক, সমস্ত বুদ্ধিমত্তার নিয়ন্তা, জড় এবং চেতন সমস্ত লোকসমূহের অধীশ্বর এবং পৃথিবীর পরম অবতার (সর্বেসর্বা) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।

তাৎপর্য

যেহেতু শ্রীল শুকদেব গোস্বামী হচ্ছেন একজন বিশিষ্ট *গতব্যলীক*, যিনি সবরকম ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত, তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত সিদ্ধির পূর্ণ প্রকাশ পরমেশ্বর ভগবান বলে তাঁর নিজ উপলব্ধি ব্যক্ত করেছেন। সকলেই লক্ষ্মীদেবীর অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, কিন্তু মানুষ জানে না যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন লক্ষ্মীদেবীর পতি। ব্রহ্ম-সংহিতায় বলা হয়েছে যে, তাঁর অপ্রাকৃত আলয় গোলোক বৃন্দাবনে তিনি সুরভী গাভীদের পালন করেন এবং সেখানে শত সহস্র লক্ষ্মীদেবী তাঁর সেবা করেন। এই সমস্ত লক্ষ্মীদেবী হচ্ছেন তাঁর অন্তরঙ্গা প্রকৃতিতে তাঁর অপ্রাকৃত আনন্দদায়িনী শক্তি বা হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ। ভগবান যখন এই পৃথিবীতে নিজেকে প্রকাশ করেন তখন জঘন্য মৈথুন সুখের অলীক আনন্দের প্রতি আকৃষ্ট বদ্ধ জীবদের আকর্ষণ করার জন্য তাঁর রাস লীলার মাধ্যমে তাঁর আনন্দদায়িনী শক্তির কার্যকলাপ আংশিকভাবে প্রদর্শন করেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মতো ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা, যাঁরা জড় জগতের জঘন্য যৌন জীবনের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্ত, যখন ভগবানের আনন্দদায়িনী শক্তির কার্যকলাপ বর্ণনা করেন তখন অবশ্যই বুঝতে হবে যে তাতে কামের নামগন্ধ নেই। পক্ষান্তরে, তাঁরা সেই বিষয়ে আলোচনা করেন মৈথুনাসক্ত জড়বাদীদের কল্পনারও অতীত এক অপ্রাকৃত মাধুর্যময় স্বাদ আস্বাদন করার জন্য। জড় জগতের যৌন জীবন মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মূল কারণ, শুকদেব গোস্বামী অবশ্যই সেই যৌন জীবনের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। আর ভগবানের আনন্দদায়িনী শক্তিরও এই প্রকার জঘন্য বিষয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন এমনই একজন নিষ্ঠাবান সন্ন্যাসী যে, তিনি কোন স্ত্রীলোককে প্রণাম করার জন্যও কাছে আসতে দিতেন না। তিনি জগন্নাথ মন্দিরে দেবদাসীদের প্রার্থনা সঙ্গীতও কখনো শুনতেন না কেননা সন্ন্যাসীর পক্ষে রমণীদের কণ্ঠে সঙ্গীত শ্রবণ করা নিষিদ্ধ। এত কঠোর সন্ন্যাসী হওয়া সত্ত্বেও বৃন্দাবনের গোপ বালিকারা যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেছিলেন তিনি তাকে ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা বলে অনুমোদন করেছেন। এই সমস্ত লক্ষ্মীদের মধ্যে শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন প্রধানা, এবং তাই তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের আনন্দের প্রতিমূর্তি এবং তার থেকে অভিন্ন।

জীবনের সর্বোচ্চ লাভ প্রাপ্তির জন্য বৈদিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে যে বর লাভ হয় তা প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্মীদেবীর কৃপা, আর লক্ষ্মীদেবীর পতি বা প্রিয়তম হওয়ার ফলে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত যজ্ঞেরও পতি। তিনি সমস্ত যজ্ঞের পরম ভোক্তা ; তাই শ্রীবিষ্ণুর আর এক নাম যজ্ঞপতি। ভগবদ্গীতায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সবকিছুই যেন যজ্ঞপতির উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয় *(যজ্ঞার্থাৎ কর্মনঃ)*, তা না হলে কর্ম জড় জগতের কর্মবন্ধনের কারণ হবে। যারা ভ্রান্ত ধারণা *(ব্যলীকম্)* থেকে মুক্ত নয় তারা ছোট ছোট দেবতাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, যেহেতু ভগবৎ ভক্তরা খুব ভালভাবে জানেন যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত যজ্ঞের পরম ভোক্তা, তাই তাঁরা তাঁরই সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সঙ্কীর্তন যজ্ঞ *(শ্রবণং কীর্তনম্ বিষ্ণো)* অনুষ্ঠান করেন যা এই কলিযুগের জন্য বিশেষভাবে অনুমোদিত হয়েছে। কলিযুগে অন্যান্য যজ্ঞ সম্পাদন করা সম্ভব নয় কেননা এই যুগে যথাযথভাবে যজ্ঞের আয়োজন করা সম্ভব নয় এবং সেই সমস্ত যজ্ঞ সম্পাদন করার উপযুক্ত পুরোহিতও নেই।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৩/১০-১১) থেকে আমরা জানতে পারি যে ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডে বদ্ধ জীবদের পুনর্জন্ম দান করার পর তাদের উপদেশ দিয়েছিলেন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে সমৃদ্ধিপূর্ণ জীবন যাপন করতে। এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হলে বদ্ধ জীবদের কখনো জীবন ধারণের জন্য কোন রকম অসুবিধা ভোগ করতে হয় না। চরমে তাঁরা তাদের অস্তিত্বকে পবিত্র করতে পারেন। তাঁরা স্বাভাবিকভাবে পারমার্থিক স্তরে উন্নীত হবেন এবং তাঁদের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবেন। বদ্ধ জীবদের কখনোই, কোন অবস্থাতে, যজ্ঞ, দান এবং তপস্যার অনুশীলন পরিত্যাগ করা উচিত নয়। এই সমস্ত যজ্ঞের উদ্দেশ্য হচ্ছে যজ্ঞপতি পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা ; তাই পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন প্রজাপতি। কঠ উপনিষদের বর্ণনা অনুসারে এক ভগবান হচ্ছেন অসংখ্য জীবের নায়ক। ভগবান জীবদের পালন করেন *(একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্)*। তাই ভগবানকে বলা হয় পরম ভূত-ভৃৎ বা সমস্ত জীবের পালন কর্তা।

জীবদের তাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে বুদ্ধি প্রদান করা হয়। সমস্ত জীবেরা সমবুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন নয় কেননা এই বুদ্ধির বিকাশের পিছনে রয়েছে ভগবানের নিয়ন্ত্রণ, যা ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) ঘোষণা করা হয়েছে। পরমাত্মারূপে ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান, এবং তার থেকে স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতির শক্তি আসে *(মত্ত স্মৃতির্জ্ঞানম্ অপোহনঞ্চ)*। ভগবানের কৃপায় কেউ স্পষ্টভাবে তাদের পূর্বকৃত কর্মসমূহ স্মরণ করতে পারে আবার কেউ পারে না। ভগবানের কৃপায় কেউ অত্যন্ত বুদ্ধিমান হয়, আবার কেউ তার সেই নিয়ন্ত্রণের প্রভাবে মূর্খ হয়। তাই ভগবান হচ্ছেন ধিয়াম্-পতি বা বুদ্ধির নিয়ন্তা।

বদ্ধ জীবেরা জড় জগতের প্রভু হওয়ার প্রয়াস করে। সকলেই তার বুদ্ধিমত্তার সর্বোত্তম প্রয়োগের মাধ্যমে জড় জগতের উপর আধিপত্য করার চেষ্টা করে। বদ্ধ জীবদের বুদ্ধিমত্তার এই অপব্যবহারকে বলা হয় উন্মত্ততা। জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যই সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ করা উচিত। কিন্তু বদ্ধ জীবেরা তাদের উন্মত্ততার ফলে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য তাদের সমস্ত শক্তি এবং বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ করে এবং ইন্দ্রিয়গণের সেই সমস্ত উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য নানা রকম অপকর্ম করে। তার ফলে মুক্ত জীবন লাভ করার পরিবর্তে উন্মত্ত বদ্ধ জীব বার বার বিভিন্ন প্রকার জড় শরীরের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। জড় জগতে আমরা যা কিছু দর্শন করি তা সবই ভগবানের সৃষ্টি। তাই তিনিই হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর প্রকৃত অধীশ্বর। ভগবানের নিয়ন্ত্রণে বদ্ধ জীব এই জড় সৃষ্টির এক অংশ উপভোগ করতে পারে, স্বতন্ত্রভাবে সে তা কখনো পারে না। ঈশোপনিষদে সেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সকলেরই কর্তব্য জগতপতি কর্তৃক প্রদত্ত বস্তুগুলি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা। উন্মত্ততার ফলেই জীব অন্যের জাগতিক সম্পত্তি অবৈধভাবে অধিকার করার চেষ্টা করে।

ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর ভগবান, বদ্ধ জীবের প্রতি তাঁর অহৈতুকী করুণার বশে, বদ্ধ জীবেদের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁর আত্মমায়ার প্রভাবে অবতরণ করেন। তিনি সকলকে তাঁর নিয়ন্ত্রণে, আংশিকভাবে ভোগ করার অধিকার লাভ করে মিথ্যা ভোক্তা হওয়ার অভিমান না করার পরিবর্তে, তাঁর শরণাগত হওয়ার উপদেশ দেন। তিনি যখন অবতরণ করেন তখন তিনি প্রমাণ করেন তাঁর ভোগ করার ক্ষমতা কত বেশি, এবং তাঁর ভোগ করার ক্ষমতা প্রদর্শন করে তিনি এক সঙ্গে ষোল হাজার পত্নীকে বিবাহ করেন। বদ্ধ জীবেরা এক পত্নীর পতি হয়ে গর্ব করে, কিন্তু ভগবান তাদের সেই মনোভাব দর্শন করে হাসেন। বুদ্ধিমান মানুষেরা জানেন প্রকৃত পতি কে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সৃষ্টিতে সমস্ত রমণীদের পতি হচ্ছেন ভগবান, কিন্তু বদ্ধ জীবেরা ভগবানের নিয়ন্ত্রণে এক বা দুই পত্নীর পতি হয়ে গর্ব অনুভব করে।

এই শ্লোকে যে বিভিন্ন প্রকার পতির উল্লেখ করা হয়েছে সেই সমস্ত যোগ্যতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই মধ্যে বিরাজমান, এবং তাই শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাকে বিশেষভাবে যদুবংশের পতি এবং গতি বলে বর্ণনা করেছেন। যদুবংশের সমস্ত সদস্যদের কাছে শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন সবকিছু, এবং শ্রীকৃষ্ণ যখন এই পৃথিবীতে তাঁর অপ্রাকৃত লীলা সংবরণ করেন তখন তাঁরা সকলে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে যদুবংশ ধ্বংস হয়েছিল, কেননা ভগবানের সঙ্গে তাঁদেরও স্বধামে ফিরে যেতে হয়েছিল। যদু বংশের ধ্বংস প্রকৃতপক্ষে ভগবানেরই সৃষ্টির ভৌতিক প্রদর্শন। প্রকৃতপক্ষে যদুবংশের সমস্ত সদস্যরা ভগবানের নিত্য পার্ষদ। ভগবান তাই সমস্ত ভক্তদের পথ প্রদর্শক এবং সেই হেতু শুকদেব গোস্বামী প্রেমাপ্লুত হৃদয়ে তাঁর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন।

শ্লোক ২১

যদঙ্ঘ্র্যভিধ্যানসমাধিধৌতয়া
ধিয়ানুপশ্যন্তি হি তত্ত্বমাত্মনঃ।
বদন্তি চৈতৎ কবয়ো যথারুচং
স মে মুকুন্দো ভগবান্ প্রসীদতাম্ ॥ ২১ ॥

যৎ-অঙ্ঘ্রি—যাঁর চরণ কমল; **অভিধ্যান**—সর্বক্ষণ চিন্তা করে; **সমাধি**—সমাধি; **ধৌতয়া**—ধৌত হয়ে; **ধিয়া**—সেই বিচিত্র বুদ্ধির দ্বারা; **অনুপশ্যন্তি**—মহাপুরুষদের অনুসরণপূর্বক দর্শন করেন; **হি**—নিশ্চিত ভাবে; **তত্ত্বম্**—পরম সত্যকে; **আত্মনঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের এবং নিজের; **বদন্তি**—তাঁরা বলেন; **চ**—ও; **এতৎ**—এই; **কবয়ো**—দার্শনিক অথবা বিদ্বান পণ্ডিতগণ; **যথারুচম্**—যেভাবে তাঁরা চিন্তা করেন; **স**—তিনি; **মে**—আমার; **মুকুন্দঃ**—শ্রীকৃষ্ণ (যিনি মুক্তি দান করেন); **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **প্রসীদতাম্**—আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন মুক্তিদাতা। মহাত্মাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রতিক্ষণ তাঁর চরণকমলের চিন্তা করার ফলে ভগবদ্ভক্তেরা সমাধিতে সেই পরম সত্যকে দর্শন করতে পারেন। কিন্তু মনোধর্মী জ্ঞানীরা তাদের কল্পনা অনুসারে তাঁকে অনুমান করতে চেষ্টা করে। সেই পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।

তাৎপর্য

যোগীরা ইন্দ্রিয় দমন করার কঠোর প্রয়াস করার পর সমাধিমগ্ন অবস্থায় সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মাকে দর্শন করলেও করতে পারেন, কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা কেবল প্রতিক্ষণ ভগবানের চরণকমলের স্মরণ করার মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ প্রকৃত সমাধিযোগে অবস্থিত হতে পারেন কেননা সে উপলব্ধির প্রভাবে তাঁর মন এবং বুদ্ধি জড় ভোগবাসনা রূপী রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়। শুদ্ধ ভক্ত মনে করেন যে তিনি জন্ম-মৃত্যুর সাগরে পতিত হয়েছেন এবং তাই তিনি নিরন্তর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন তাঁকে উদ্ধার করার জন্য। তাঁর একমাত্র বাসনা হচ্ছে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে একটি অপ্রাকৃত ধূলিকণায় পরিণত হতে। ভগবানের কৃপার প্রভাবে শুদ্ধ ভক্ত জড় সুখভোগের সমস্ত আসক্তি থেকে মুক্ত হন, এবং জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সর্বক্ষণ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের চিন্তা করেন। ভগবানের একজন মহান ভক্ত, সম্রাট কুলশেখর প্রার্থনা করেছেন—

কৃষ্ণ তদীয়-পদ-পঙ্কজ-পঞ্জরান্তম্
অদ্যৈব মে বিশতু মানসরাজহংসঃ।

প্রাণপ্রয়াণসময়ে কফবাতপিত্তৈঃ
কণ্ঠাবরোধনবিধৌ স্মরণং কুতস্তে ॥

"হে শ্রীকৃষ্ণ, আমি প্রার্থনা করি যেন আমার মনরূপী রাজহংস তোমার শ্রীপাদপদ্মরূপ সরোবরে ডুব দিয়ে তার জলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে ; তা না হলে প্রাণ ত্যাগ করার সময়, যখন আমার কণ্ঠ কফ, বায়ু এবং পিত্তের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন আমি কিভাবে তোমাকে স্মরণ করব ?"

হংস এবং মৃণালের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তাই এই উপমাটি অত্যন্ত উপযুক্ত হয়েছে ; হংস বা পরমহংস না হলে ভগবানের চরণকমলের জালে প্রবেশ করা যায় না। ব্রহ্ম-সংহিতায় যে বর্ণনা করা হয়েছে, মনোধর্মী জ্ঞানীরা তাদের পাণ্ডিত্যের দ্বারা চেষ্টা করেও অন্তকালে স্বপ্নেও পরম তত্ত্বকে জানবার কথা কল্পনা করতে পারে না। এই প্রকার জ্ঞানীদের কাছে প্রকট না হওয়ার অধিকার ভগবানের আছে। যেহেতু তারা ভগবানের চরণকমলরূপী মৃণালের জালে প্রবেশ করতে পারে না, তাই বিভিন্ন মনোধর্মীর বিভিন্ন সিদ্ধান্ত রয়েছে, এবং চরমে তারা একটা অর্থহীন বোঝাপড়া করে নিয়ে তাদের রুচি অনুসারে সিদ্ধান্ত করে যে, 'যত মত তত পথ'। কিন্তু ভগবান কোন দোকানদার নন যে তিনি তাঁর সবরকম মনোধর্মী খরিদ্দারদের মনোরঞ্জন করার চেষ্টা করবেন। ভগবান হচ্ছেন পরমেশ্বর, এবং তিনি কেবল তাঁর কাছেই পূর্ণ শরণাগতি দাবী করেন। শুদ্ধ ভক্তেরা কিন্তু পুর্ববর্তী মহাজনদের বা আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে স্বচ্ছ মাধ্যমরূপী সদ্‌গুরুর মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে পারেন *(অনুপশ্যন্তি)*। শুদ্ধ ভক্তেরা কখনো মনের আকাশকুসুম কল্পনার মাধ্যমে ভগবানকে দর্শন করার চেষ্টা করেন না, পক্ষান্তরে তাঁরা আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন *(মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ)*। তাই ভগবান এবং তার ভক্ত সম্বন্ধে বৈষ্ণব আচার্যদের সিদ্ধান্তে কোন মতবিরোধ নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস/কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ'। জীব ভগবানের নিত্য দাস এবং সে যুগপৎ ভগবান থেকে ভিন্ন এবং অভিন্ন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই তত্ত্ব চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই স্বীকার করে (মুক্তি লাভের পরে জীব ভগবানের নিত্য দাসত্ব অঙ্গীকার করে), এবং কোন বৈষ্ণব আচার্যই মনে করেন না যে, ভগবান এবং তিনি এক।

সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত ভগবানের শুদ্ধভক্তের এই বিনম্রতা ভক্তকে এমনই এক সমাধিতে মগ্ন করে যার প্রভাবে তিনি সবকিছু উপলব্ধি করতে পারেন, কেননা ভগবানের ঐকান্তিক ভক্তের কাছে ভগবান নিজেকে প্রকাশ করেন, যে কথা ভগবদ্গীতায় (১০/১০) উল্লেখ করা হয়েছে। ভগবান সকলের বুদ্ধির অধীশ্বর হওয়ার ফলে (এমনকি অভক্তদেরও) তিনি তাঁর ভক্তকে সমুচিত বুদ্ধি প্রদান করেন যার প্রভাবে শুদ্ধ ভক্ত ভগবান এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তি সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত হন। ভগবান কখনো কারো জল্পনা কল্পনার দ্বারা অথবা পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে বাক্য বিন্যাসের

প্রভাবে প্রকাশিত হন না, পক্ষান্তরে তিনি যখন তাঁর ভক্তের সেবা বৃত্তির প্রভাবে তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ রূপে প্রসন্ন হন তখন তিনি তাঁর সেই ভক্তের কাছে নিজেকে প্রকাশিত করেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মনোধর্মী জ্ঞানী অথবা 'যত মত তত পথ' সিদ্ধান্তের সমর্থক নন, পক্ষান্তরে তিনি ভগবানের প্রসন্নতা কামনা করে কেবল তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছেন। ভগবানকে জানার এইটিই হচ্ছে পন্থা।

শ্লোক ২২

প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী
বিতন্বতাজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি।
স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ
সমে ঋষীণামৃষভঃ প্রসীদতাম্ ॥ ২২ ॥

প্রচোদিতা—অনুপ্রাণিত; **যেন**—যার দ্বারা; **পুরা**—সৃষ্টির প্রারম্ভে; **সরস্বতী**—বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী; **বিতন্বতা**—বিস্তারিত; **অজস্য**—প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মার; **সতীম স্মৃতিম্**—শক্তিশালী স্মৃতিশক্তি; **হৃদি**—হৃদয়ে; **স্ব**—নিজস্ব; **লক্ষণা**—উদ্দেশ্য; **প্রাদুরভূৎ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **কিল**—যেন; **আস্যতঃ**—মুখ থেকে; **স**—তিনি; **মে**—আমাকে; **ঋষীণাম্**—শিক্ষকদের; **ঋষভঃ**—প্রধান; **প্রসীদতাম্**—প্রসন্ন হোন।

অনুবাদ

যিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মার হৃদয়ে শক্তিশালী জ্ঞান বিকশিত করেছিলেন এবং সৃষ্টি এবং তাঁর নিজের সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান প্রদান করে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, এবং সেই বেদরূপা সরস্বতী ব্রহ্মার মুখ থেকে প্রকাশিতা হয়েছিলেন। সমস্ত জ্ঞানদাতা ঋষিদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সেই পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।

তাৎপর্য

পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে ব্রহ্মা থেকে শুরু করে নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্ত জীবের পরমাত্মারূপে ভগবান সকলকে বাঞ্ছিত জ্ঞান প্রদান করেন। জীব ভগবানের শক্তির চৌষট্টি ভাগের পঞ্চাশ ভাগ বা ৭৮% জ্ঞান অর্জন করতে পারে। জীব যেহেতু তার স্বরূপে ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তাই তার পক্ষে ভগবানের পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। বদ্ধ অবস্থায়, জীবের পরিবর্তন বা মৃত্যুর পর জীব সব কিছু ভুলে যায় সেই বলবতী জ্ঞান পুনরায় হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বিরাজমান ভগবানের কৃপায় পুনরায় প্রকাশিত হয় এবং তাকে বলা হয় জ্ঞানের জাগরণ, কেননা অচেতন বা সুপ্ত অবস্থা থেকে জেগে ওঠার সাথে তার তুলনা করা যায়। জ্ঞানের এই জাগরণ পূর্ণরূপে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং তাই ব্যবহারিক জগতে আমরা বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিভিন্ন স্তরের জ্ঞান দর্শন

করি। জ্ঞানের এই উদয় আপনা থেকে হয় না অথবা জাগতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে হয় না। তার উৎস হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান (*ধিয়াং পতি*)

এমন কি, ব্রহ্মা পর্যন্ত পরম স্রষ্টার এই নিয়মের অধীন। সৃষ্টির প্রারম্ভে কোন পিতামাতা ব্যতীতই ব্রহ্মার জন্ম হয়েছিল, কেননা ব্রহ্মার পূর্বে কোন জীব ছিল না। ব্রহ্মার জন্ম হয় গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি পদ্ম থেকে উদ্ভূত পদ্ম থেকে, এবং তাই তাকে বলা হয় অজ। এই ব্রহ্মা বা অজও ভগবানের বিভিন্ন অংশ একটি জীব, কিন্তু ভগবানের অত্যন্ত পুণ্যবান ভক্ত হওয়ার ফলে, প্রকৃতির দ্বারা ভগবানের মুখ্য সৃষ্টির পর তিনি ভগবান কর্তৃক সৃষ্টিকার্যে অনুপ্রাণিত হন।

তাই জড়া প্রকৃতি এবং ব্রহ্মা উভয়ই ভগবান থেকে স্বতন্ত্র নন। জড় বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃতির প্রতিক্রিয়াসমূহই কেবল অবলোকন করতে পারে, তারা সেই কার্যকলাপের পিছনে যে একজন পরিচালক আছে, তা বুঝতে পারে না, ঠিক যেমন পাওয়ার হাউসের ইঞ্জিনিয়ার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ একটি শিশু বিদ্যুতের কার্যকলাপ দর্শন করে।

ভৌতিক বৈজ্ঞানিকদের এই অসম্পূর্ণ জ্ঞানের কারণ হচ্ছে তাদের অল্পজ্ঞতা। তাই বৈদিক জ্ঞান প্রথমে ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রদান করা হয়েছিল, এবং সেই জ্ঞান ব্রহ্মা বিতরণ করেন। নিঃসন্দেহে ব্রহ্মা হচ্ছেন বৈদিক জ্ঞানের প্রবক্তা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবানই তাঁকে এই দিব্য জ্ঞান লাভের জন্য অনুপ্রাণিত করেন, কেননা এই জ্ঞান সরাসরিভাবে ভগবানের থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন। বেদকে তাই বলা হয় *অপৌরুষেয়*, অর্থাৎ কোন সৃষ্ট জীব থেকে তার উদ্ভব হয়নি।

সৃষ্টির পূর্বেও ভগবান ছিলেন (*নারায়ণঃ পরো ব্যক্তা*), এবং তাই ভগবানের এই বাণী হচ্ছে অপ্রাকৃত শব্দ তরঙ্গ। প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত এই দুই প্রকার শব্দ তরঙ্গের মধ্যে এক বিরাট পার্থক্য রয়েছে। পদার্থবিদেরা কেবল প্রাকৃত ধ্বনি বা জড় আকাশে স্পন্দিত ধ্বনিরই বিচার করতে পারে। তাই আমাদের বুঝতে হবে যে, সাংকেতিক অভিব্যক্তিতে ব্যক্ত হয়েছে যে বৈদিক জ্ঞান, তা ভগবান থেকে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা থেকে নারদ, নারদ থেকে ব্যাসদেব—এইভাবে গুরুপরম্পরা ধারায় অনুপ্রাণিত না হলে এই অপ্রাকৃত জ্ঞান ব্রহ্মাণ্ডের কেউই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

বৈদিক মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ কোন জড় পণ্ডিত অনুবাদ অথবা প্রকাশ করতে পারে না। সদ্‌গুরু কর্তৃক দীক্ষিত বা অনুপ্রাণিত না হলে তা কখনোই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। আদি গুরু হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান, এবং পরম্পরা ধারায় সেই জ্ঞান প্রবাহিত হয়, যা ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব, বৈধ পরম্পরার মাধ্যমে প্রাপ্ত না হলে সেই মন্ত্র নিষ্ফল (*নিষ্ফলা মতাঃ*), যদিও তিনি জড়জাগতিক শিল্প শাস্ত্র এবং বিজ্ঞানে তিনি মহা পণ্ডিত হতে পারেন।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁর হৃদয়ের অন্তস্থলে বিরাজমান ভগবান কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছেন যে, সৃষ্টি সম্বন্ধে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নগুলির উত্তর

তিনি যেন যথাযথভাবে দিতে পারেন। সদ্‌গুরু জড় পণ্ডিতদের মতো মনোধর্মী অনুমানকারী নন, পক্ষান্তরে তিনি হচ্ছেন *শ্রোত্রিয়ম ব্রহ্মনিষ্ঠম্*।

শ্লোক ২৩

ভূতৈর্মহদ্ভির্য ইমাঃ পুরো বিভু-
র্নির্মায় শেতে যদমূষু পূরুষঃ।
ভুঙ্‌ক্তে গুণান্ ষোড়শ ষোড়শাত্মকঃ
সোঽলংকৃষীষ্ট ভগবান্ বচাংসি মে ॥ ২৩ ॥

ভূতৈঃ—সৃষ্টির উপাদানসমূহের দ্বারা ; **মহদ্ভিঃ**—জড় সৃষ্টির ; **যঃ**—যিনি ; **ইমাঃ**— এই সমস্ত ; **পুরঃ**—শরীর ; **বিভুঃ**—ভগবানের ; **নির্মায়**—সৃষ্টি করার জন্য ; **শেতে**— শয়ন করেন ; **যৎ-অমূষু**—যিনি অবতরণ করেছেন ; **পূরুষঃ**—শ্রীবিষ্ণু ; **ভুঙ্‌ক্তে**— প্রভাবিত করেন ; **গুণান্**—প্রকৃতির তিনটি গুণ ; **ষোড়শ**—ষোলভাগে ; **ষোড়শাত্মকঃ**—এই ষোলটির জনক হওয়ার ফলে ; **সঃ**—তিনি ; **অলংকৃষীষ্ট**— অলংকৃত করতে পারেন ; **ভগবান**—পরমেশ্বর ভগবান ; **বচাংসি**—বাণী ; **মে**—আমার।

অনুবাদ

যে পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে শয়ন করে প্রকৃতির উপাদান থেকে সৃষ্ট সমস্ত শরীরকে উজ্জীবিত করেন, এবং পুরুষাবতাররূপে জীবকে তার জড় শরীরের জনক ষোলটি গুণের (একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূত) অধীনস্থ করেন, সেই ভগবান যেন আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমার বাণীকে অলংকৃত করেন।

তাৎপর্য

সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত ভক্ত, শুকদেব গোস্বামী (জড় বিষয়াসক্ত মানুষদের মতো নিজের ক্ষমতার গর্বে গর্বিত না হয়ে) পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য প্রার্থনা করেছেন যাতে তাঁর বাণী সফল হয় এবং শ্রোতাগণ কর্তৃক সমাদৃত হয়। ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই সফলভাবে সম্পাদিত সমস্ত কার্যে নিজেকে নিমিত্ত মাত্র বলে মনে করেন, এবং তার কোন কার্যের জন্য কোন রকম কৃতিত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। পরম আত্মা ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত যে তৃণও নড়তে পারে না, সে কথা না জেনে ভগবৎ বিমুখ নাস্তিকেরা সবসময় তাদের কার্যকলাপের সমস্ত কৃতিত্ব দাবী করে। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাই পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশনায় অগ্রসর হতে চেয়েছেন, যিনি ব্রহ্মাকে বৈদিক জ্ঞান দান করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। বৈদিক শাস্ত্রে যে সমস্ত তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে তা স্বকপোল কল্পিত মতবাদ নয় অথবা মনগড়া গল্প নয়, যা অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা অনেক সময় মনে করে থাকে। বৈদিক তত্ত্ব বাস্তবিক সত্যে পূর্ণ বিবরণ যাতে কোন ত্রুটি বা ভ্রম নেই। শুকদেব গোস্বামী সৃষ্টি তত্ত্ব দার্শনিক অনুমানের

ভিত্তিতে বর্ণনা করতে চাননি, পক্ষান্তরে ব্রহ্মা যেভাবে ভগবান কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে তা বর্ণনা করেছিলেন ঠিক সেইভাবে বাস্তবিক তত্ত্বের ভিত্তিতে বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন। ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) বর্ণনা করা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন বেদান্তের জনক, এবং তিনি কেবল বেদান্ত দর্শনের প্রকৃত অর্থ জানেন। তাই ধর্ম সম্বন্ধে বেদে বর্ণিত সিদ্ধান্ত থেকে শ্রেষ্ঠ আর কোন সত্য নেই। এই বৈদিক জ্ঞান বা ধর্ম শুকদেব গোস্বামীর মতো মহাজনদের দ্বারা প্রচারিত হয়েছে, কেননা তাঁরা হচ্ছেন ভগবানের বিনীত সেবক যাদের স্বনিযুক্ত ব্যাখ্যাকার হওয়ার বাসনা ছিল না। বৈদিক জ্ঞান ব্যাখ্যা করার এইটিই বিধি যাকে বলা হয় পরম্পরা।

বুদ্ধিমান মানুষেরা সহজেই অনুমান করতে পারেন কোন জড় সৃষ্টি (তার নিজের দেহই হোক অথবা কোন ফল বা ফুল হোক) চেতনের স্পর্শ বিনা সুন্দরভাবে বর্ধিত হতে পারে না। এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন মানুষেরা অথবা শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা অত্যন্ত সুন্দরভাবে তাঁদের মতামত ততক্ষণই কেবল প্রকাশ করতে পারেন যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের শরীরে আত্মা বিরাজমান থেকে শরীরকে জীবিত রাখে। তাই সমস্ত সত্যের উৎস হচ্ছেন পরমাত্মা, জড় পদার্থ নয় যা জড়বাদীরা ভ্রান্তিবশত মনে করে থাকে। বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে সৃষ্টির আদিতে জড় ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তর শূন্য ছিল এবং ভগবান তাতে প্রবেশ করে একে একে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত উপাদানগুলি প্রকাশ করেন। তেমনই পরমাত্মারূপে ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছেন ; তাই সব কিছুই তাঁরই দ্বারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সম্পাদিত হচ্ছে। সৃষ্টির ষোলটি তত্ত্ব, যথা ভূমি, অপ, অনল, বায়ু, আকাশ এবং একাদশ ইন্দ্রিয় প্রথমে ভগবান থেকে প্রকাশিত হয় এবং তারপর জীব কর্তৃক গৃহীত হয়। এইভাবে জীবের উপভোগের জন্য জড় উপাদানগুলির সৃষ্টি হয়। সমগ্র জড় সৃষ্টির পরিচালনার যে সুন্দর ব্যবস্থা তা সম্ভব হয়েছে ভগবানেরই শক্তির প্রভাবে, এবং জীব কেবল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে পারে যাতে সে তা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। যেহেতু ভগবান হচ্ছেন পরম সত্তা, শুকদেব গোস্বামী থেকে ভিন্ন, তাই শুকদেব গোস্বামী তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে পেরেছেন। ভগবান জীবকে জড় সৃষ্টি উপভোগ করতে সাহায্য করেন, কিন্তু তিনি এই প্রকার সমস্ত ভ্রান্ত উপভোগ থেকে দূরে থাকেন। শুকদেব গোস্বামী কেবল সেই সত্য বর্ণনা করতে সাহায্য করার জন্য ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করেননি, তিনি তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছেন যে, তিনি যেন তাঁর শ্রোতাদেরও সাহায্য করেন।

শ্লোক ২৪

নমস্তস্মৈ ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে।
পপুর্জ্ঞানময়ং সৌম্যা যন্মুখাম্বুরুহাসবম্ ॥ ২৪ ॥

নমঃ—আমার প্রণতি ; **তস্মৈ**—তাঁকে ; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে ; **বাসুদেবায়**—বাসুদেবকে অথবা তাঁর অবতারকে ; **বেধসে**—বৈদিক শাস্ত্রের সঙ্কলনকারী ;

পপু—পান করেছিলেন; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **অয়ম্**—এই বৈদিক জ্ঞান; **সৌম্যাঃ**—ভক্তগণ, বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদেরা; **যৎ**—যাঁর থেকে; **মুখ-অম্বুরুহ**—কমলসদৃশ মুখ; **আসবম্**—তাঁর মুখনিঃসৃত অমৃত।

অনুবাদ

আমি বৈদিক শাস্ত্রের সঙ্কলনকর্তা, বাসুদেবের অবতার শ্রীল ব্যাসদেবকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। শুদ্ধ ভক্তেরা ভগবানের মুখারবিন্দ থেকে নিঃসৃত অমৃতময় দিব্যজ্ঞান পান করেন।

তাৎপর্য

বেধসে বা 'দিব্য জ্ঞানের সঙ্কলনকারী' শব্দটির ব্যাখ্যা করে শ্রীল শ্রীধর স্বামী মন্তব্য করেছেন যে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করা হয়েছে বাসুদেবের অবতার শ্রীল ব্যাসদেবকে। শ্রীল জীব গোস্বামী তা স্বীকার করেছেন, কিন্তু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর অধিক অগ্রবর্তী, যথা,শ্রীকৃষ্ণের মুখামৃত তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে স্থানান্তরিত হয় এবং তার ফলে তাঁরা সঙ্গীত, নৃত্য, বেশ শয্যা, অলঙ্করণ আদি শ্রীকৃষ্ণের আনন্দদায়ক ললিত কলায় পারদর্শিতা লাভ করেন। এই প্রকার সঙ্গীত, নৃত্য এবং অলঙ্করণ যা ভগবান উপভোগ করেন তা কখনই জড়জাগতিক নয়, কেননা শুরুতেই ভগবানকেপরা বা চিন্ময় বলে সম্বোধন করা হয়েছে। আত্মবিস্মৃত বদ্ধ জীবদের কাছে এই দিব্য জ্ঞান অজ্ঞাত। পরমেশ্বর ভগবানের অবতার শ্রীল ব্যাসদেব বদ্ধ জীবদের পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাদের নিত্য সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য এই বৈদিক শাস্ত্রসমূহ সঙ্কলন করেছেন। তাই মানুষের কর্তব্য, বৈদিক শাস্ত্র,বা শৃঙ্গার রসে ভগবান থেকে তাঁর নিত্য সহচরীদের মধ্যে সঞ্চারিত অমৃত, ব্যাসদেব বা শুকদেবের মুখপদ্ম থেকে শ্রবণ করার মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা। অপ্রাকৃত জ্ঞানের ক্রমবিকাশের ফলে ভগবান কর্তৃক রাস লীলায় পরিবেশিত সঙ্গীত এবং নৃত্যের অপ্রাকৃত কলা হৃদয়ঙ্গম করার স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কিন্তু গভীর দার্শনিক আলোচনা এবং রাস নৃত্যে ভগবানের চুম্বনরূপ অমৃত সমভাবে আস্বাদন করেন, কেননা এই দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

শ্লোক ২৫

এতদেবাত্মভূ রাজন্ নারদায় বিপৃচ্ছতে।
বেদগর্ভোঽভ্যধাৎ সাক্ষাদ্ যদাহ হরিরাত্মনঃ ॥ ২৫ ॥

এতৎ—এই বিষয়ে; **এব**—ঠিক এইভাবে; **আত্মভূ**—প্রথম জন্মা (ব্রহ্মাজী); **রাজন্**—হে রাজন্; **নারদায়**—নারদ মুনিকে; **বিপৃচ্ছতে**—জিজ্ঞাসিত হয়ে;**বেদ-গর্ভঃ**—জন্মের সময় থেকেই যাঁর মধ্যে বৈদিক জ্ঞানের সঞ্চার হয়েছিল; **অভ্যধাৎ**—

জ্ঞাপন করা হয়েছিল; **সাক্ষাৎ**—সরাসরিভাবে; **যদাহ**—তিনি যা বলেছিলেন; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের (ব্রহ্মার) প্রতি।

অনুবাদ

হে রাজন্ প্রথম জন্মা, জন্ম থেকেই যাঁর মধ্যে বৈদিক জ্ঞানের সঞ্চার হয়েছিল, তাঁর সেই পুত্র ব্রহ্মাকে ভগবান নিজ মুখে যে জ্ঞান দান করেছিলেন, ব্রহ্মাও নারদ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে তাঁকে সেই কথাই বলেছিলেন।

তাৎপর্য

বিষ্ণুর নাভি পদ্ম থেকে যখন ব্রহ্মার জন্ম হয় তখনই তার মধ্যে বৈদিক জ্ঞানের সঞ্চার হয়েছিল, এবং তাই তিনি বেদগর্ভ নামে পরিচিত অর্থাৎ জন্ম থেকেই যিনি ছিলেন বেদান্ত তত্ত্ববেত্তা। বৈদিক জ্ঞান বা পূর্ণ অচ্যুত জ্ঞান ব্যতীত কেউই সৃষ্টি করতে পারে না। সমস্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং পূর্ণ জ্ঞান হচ্ছে বৈদিক। বেদে সব রকম তত্ত্ব পাওয়া যায়, এবং তাই ব্রহ্মার মধ্যে সমস্ত পূর্ণ জ্ঞান সঞ্চার করা হয়েছিল যাতে তিনি সৃষ্টি করতে সমর্থ হতে পারেন। তাই ব্রহ্মা সৃষ্টির পূর্ণ বিবরণ সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, যেহেতু সে সম্বন্ধে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি তাকে যথাযথ জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। নারদ মুনি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে, ব্রহ্মা ঠিক যেভাবে সাক্ষাৎ ভগবানের কাছ থেকে সেই জ্ঞান শ্রবণ করেছিলেন ঠিক সেইভাবে তা দান করেছিলেন। নারদ আবার ব্যাসদেবকে ঠিক সেইভাবে তা বলেছিলেন, এবং ব্যাসদেব নারদ মুনির কাছ থেকে ঠিক যেভাবে শুনেছিলেন তা শুকদেব গোস্বামীকে বলেছিলেন। আর শুকদেব গোস্বামী ব্যাসদেবের কাছ থেকে যা শুনেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করতে যাচ্ছিলেন। এইটিই হচ্ছে বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করার বিধি। উপরোক্ত পরম্পরা ধারার মাধ্যমেই কেবল বেদের ভাষা হৃদয়ঙ্গম করা যায়, অন্য কোন উপায়ে তা সম্ভব নয়।

কল্পনাপ্রসূত মতবাদের কোন প্রয়োজন নেই। জ্ঞান অবশ্যই বাস্তব হওয়া উচিত। অনেক জটিল বিষয় রয়েছে, এবং সেই বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি তা বুঝিয়ে না দিলে তা বোঝা যায় না। বৈদিক জ্ঞান বোঝা অত্যন্ত কঠিন এবং তা অবশ্যই উপরোক্ত প্রণালীতে শেখা কর্তব্য; তা না হলে তা বোঝা মোটেই সম্ভব নয়।

তাই শুকদেব গোস্বামী ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করেছেন যাতে ভগবান সাক্ষাৎ ব্রহ্মাকে যে জ্ঞান দান করেছিলেন, অথবা ব্রহ্মা সাক্ষাৎ নারদ মুনিকে যে জ্ঞান দান করেছিলেন, তা যেন তিনি যথাযথভাবে পুনরাবৃত্তি করতে পারেন। অতএব, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কর্তৃক বর্ণিত সৃষ্টি বিষয়ক বর্ণনাকে কাল্পনিক মতবাদ বলে জড়বাদীরা যে মত পোষণ করে থাকে, তা আদৌ ঠিক নয়; পক্ষান্তরে তাঁর সেই বর্ণনা পূর্ণ সত্য। যে ব্যক্তি সেই বাণী যথাযথভাবে শ্রবণ করে তা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেন তিনি জড় সৃষ্টির বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পারেন।

ইতি 'সৃষ্টির প্রকরণ' নামক শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।